বাংলা

স্নাতকোত্তর (সিবিসিএস) কার্যক্রম

এম.এ.

চতুর্থ সেমেস্টার

পত্র—ডিএসই/DSE-৪০৪

বিশেষপত্র : ভাষাতত্ত্ব

পাঠ-সহায়ক উপাদান

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ
ডাইরেক্টরেট অফ ওপেন এ্যান্ড ডিস্ট্যান্স লার্নিং
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
কল্যাণী, নদীয়া-৭৪১২৩৫
পশ্চিমবঙ্গ

Post Graduate Board of Studies (PGBOS) Members of Department of Bengali, Directorate of Open and Distance Learning (DODL), University of Kalyani.

Sl. No.	Name & Designation	Role
1	**Prof. (Dr.) Sanjit Mondal,** Professor & Head, Department of Bengali, University of Kalyani.	Chairperson
2	**Prof. (Dr.) Sabitri Nanda Chakraborty** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
3	**Prof. (Dr.) Sukhen Biswas,** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
4	**Prof. (Dr.) Prabir Pramanick,** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
5	**Prof. (Dr.) Nandini Bandyopadhyay,** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
6	**Prof. (Dr.) Adityakumar Lala,** Professor, Department of Bengali, Gourbanga University	External Nominated Member
7	**Prof. (Dr.) Narugopal Dey,** Professor, Department of Bengali, Sidho Kanho Birsha University	External Nominated Member
8	**Dr. Rajsekhar Nandi,** Assistant Professor of Bengali, DODL, University of Kalyani.	Member
9	**Prof. (Dr.) Tapati Chakrabarty,** Director, DODL, University of Kalyani	Convener

পাঠ প্রণেতা

অধ্যাপক (ড.) সুখেন বিশ্বাস — অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক (ড.) সঞ্জিৎ মণ্ডল — অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

এপ্রিল, ২০২৪

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত ও ইস্ট ইন্ডিয়া ফটো কম্পোজিং সেন্টার, ২০৯এ, বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬ দ্বারা মুদ্রিত।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি ব্যতীত বর্তমান পাঠ সহায়ক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত কোনো অংশের অন্যত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ।

কপিরাইট আইন অনুসারে পাঠ-সহায়ক উপাদানের জন্য লেখক বা পাঠ প্রণেতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন।

Director's Message

Satisfying the varied needs of distance learners, overcoming the obstacle of Distance and reaching the unreached students are the three fold functions catered by Open and Distance Learning (ODL) systems. The onus lies on writers, editors, production professionals and other personnel involved in the process to overcome the challenges inherent to curriculum design and production of relevant Self-Learning Materials (SLMs). At the University of Kalyani a dedicated team under the able guidance of the Hon'ble Vice-Chancellor has invested its best efforts, professionally and in keeping with the demands of Post Graduate CBCS Programmes in Distance Mode to devise a self-sufficient curriculum for each course offered by the Directorate of Open and Distance Learning (DODL), University of Kalyani.

Development of printed SLMs for students admitted to the DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2020 had been our endeavor. We are happy to have achieved our goal.

Utmost care and precision have been ensured in the development of the SLMs, making them useful to the learners, besides avoiding errors as far as practicable. Further suggestions from the stakeholders in this would be welcome.

During the production-process of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from **Professor (Dr.) Amalendu Bhunia, Hon'ble Vice-Chancellor, University of Kalyani**, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it with in proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Sincere gratitude is due to the respective chairpersons as well as each and every member of the PG-BoS (DODL), University of Kalyani. Heartfelt thanks are also due to the Course Writers-faculty members at the DODL, subject-experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have enriched the SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I would especially like to convey gratitude to all other University dignitaries and personnel involved either at the conceptual or operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their persistent and coordinated efforts have resulted in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self-Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyrights reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self-Learning Materials are self writing and collected from e-book, journals and websites.

Director
Directorate of Open and Distance Learning
University of Kalyani

পাঠক্রম

পত্র—ডিএসই/DSE-৪০৪

বিশেষ পত্র : ভাষাতত্ত্ব

ভাষা আলোচনায় পাশ্চাত্ত্য ধারা

পর্যায় গ্রন্থ ১ : (সময় ৪ ঘণ্টা)

প্রাচীন গ্রীস ও রোমের ভাষাতত্ত্ব চর্চা : প্লেটো, অ্যারিস্টটল, থ্রাক্স, দুসকোলোস, ভারো, কুইন্তিলিয়ানুস, দোনাতুস, প্রিস্কিয়ানুস, বোয়োথিউস

পর্যায় গ্রন্থ ২ : (সময় ৪ ঘণ্টা)

জার্মানীর ও ইংল্যাণ্ডের ভাষাতত্ত্বচর্চা : শ্লেগেল রাস্ক, গ্রীম, ফ্রীদিশ পট, শ্লাইসার, ব্রুগম্যান, হেনরি, সুইট, ড্যানিয়েল জোনস, উইলিয়াম জোনস

পর্যায় গ্রন্থ ৩ : (সময় ৪ ঘণ্টা)

বিশ্বভাষা, গঠনমূলক ভাষাচর্চা : ফের্দিনা দ্য স্যোসুর, ল্যাঙ্গুয়েজ প্লানিং

পর্যায় গ্রন্থ ৪ : (সময় ৪ ঘণ্টা)

চমস্কির ভাষাবিজ্ঞান : ভাষাবোধ-ভাষাপ্রয়োগ, অধোগঠন-অধিগঠন, ভাষার সংবর্তন, ভাষা বিশ্বজনীনতা

পত্র—ডিএসই/DSE-৪০৪
বিশেষ পত্র : ভাষাতত্ত্ব

সূচিপত্র

ডিএসই-৪০৪	শিরোনাম	পাঠ প্রণেতা	পৃষ্ঠা
পর্যায় গ্রন্থ ১	প্রাচীন গ্রীস ও রোমের ভাষাতত্ত্ব চর্চা : প্লেটো, অ্যারিস্টটল, থ্রাক্স, দুসকোলোস, ভারো, কুইন্তিলিয়ানুস, দোনাতুস, প্রিস্কিয়ানুস, বোয়োথিউস	অধ্যাপক (ড.) সঞ্জিৎ মণ্ডল	১-১০
পর্যায় গ্রন্থ ২	জার্মানীর ও ইংল্যাণ্ডের ভাষাতত্ত্বচর্চা : শ্লেগেল রাস্ক, গ্রীম, ফ্রীদিশ পট, শ্লাইসার, ব্রুগম্যান, হেনরি, সুইট, ড্যানিয়েল জোনস, উইলিয়াম জোনস	অধ্যাপক (ড.) সঞ্জিৎ মণ্ডল	১১-২০
পর্যায় গ্রন্থ ৩	বিশ্বভাষা, গঠনমূলক ভাষাচর্চা : ফের্দিনা দ্য স্যোসুর, ল্যাঙ্গুয়েজ প্লানিং	অধ্যাপক (ড.) সুখেন বিশ্বাস	২১-৩৩
পর্যায় গ্রন্থ ৪	চমস্কির ভাষাবিজ্ঞান : ভাষাবোধ-ভাষাপ্রয়োগ, অধোগঠন-অধিগঠন, ভাষার সংবর্তন, ভাষা বিশ্বজনীনতা	অধ্যাপক (ড.) সুখেন বিশ্বাস	৩৪-৭১

পত্র : ডিএসই-৪০৪

বিশেষ পত্র : ভাষাতত্ত্ব

পর্যায় গ্রন্থ : ১

একক-১

প্রাচীন গ্রিস ও রোমের ভাষাতত্ত্ব চর্চা

বিন্যাসক্রম :

৪০৪.১.১.১ : ভূমিকা

৪০৪.১.১.২ : প্লেটোর ভাষাচর্চার নানাদিক

৪০৪.১.১.৩ : অ্যারিস্টটলের ভাষাচর্চার ইতিবৃত্ত

৪০৪.১.১.৪ : দিওনুসিয়াস থ্রাক্সের ব্যাকরণচর্চা

৪০৪.১.১.৫ : হেরোদিয়ানুস ও দুসকোলোস-এর ভাষাচর্চার মূলসূত্র

৪০৪.৩.৮.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৪০৪.১.১.১ : ভূমিকা

যে-কোনো বিদ্যার আদি উন্মেষের সঙ্গে ধর্ম সম্পৃক্ত। খ্রিষ্টের জন্মের প্রায় হাজার বছর আগে ফিনিশিয় বণিকদের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বর্ণমালা ছড়িয়ে পড়ে। ভাষাকে লিখিত রূপ দিয়ে ভাষাকে বেঁধে ফেলার ধারণাটি ভাষা-চর্চার ইতিহাসে যুগান্তর এনেছিল-এমন মন্তব্য করেন ড. নীলিমা চক্রবর্তী, উদয়কুমার চক্রবর্তী 'ভাষাচর্চা-ভাষাপ্রস্থান' গ্রন্থে [২০২২, ১২৬]। বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট অধ্যায়ে এক ভাষা থেকে বহু ভাষা বিস্তারের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর লেখক হেরোদোতোসের 'The Histories' গ্রন্থে ভাষাজিজ্ঞাসার একটি দিকের উল্লেখ পাই- পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষা ফ্রিজিয় ভাষা। ভাষা নিয়ে এরকম নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার কথা আছে। কিন্তু তাতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি কার্যকর ছিল না। পাশ্চাত্যে গ্রিকদের ভাষাজিজ্ঞাসা থেকেই ভাষা আলোচনার যথাযথ রূপ পাওয়া গেল। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী থেকেই গ্রিক ধ্রুপদী যুগ শুরু হয়েছে। দর্শন, নীতিশাস্ত্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, কাব্যতত্ত্ব নিয়ে গ্রিকদের চিন্তা চেতনার নিদর্শন পরবর্তীতে আমরা পেয়েছি। প্রোটাগোরাস গর্গিয়াস, প্রোডিকাস, হিপ্পিয়াস, ক্রাটাইলাস, সক্রেটিস প্রমুখ গ্রিসদেশের ঋষিগণ ভাষার বিভিন্ন দিকের আলোচনা

করেন।ভাষার প্রকৃতি, বিভিন্ন প্রকার বাক্যের কথা, শব্দের নির্ভুল ব্যবহারের কথা, বিচ্ছিন্নভাবে স্থান পেয়েছে। কিন্তু প্রথাবদ্ধভাবে ব্যাকরণ, ভাষাশাস্ত্রের পূর্ণতর রূপ গঠিত হয়নি। প্লেটো তথা প্লাতোর হাত ধরেই গ্রিস দেশে ব্যাকরণচর্চার প্রকৃত সূত্রপাত ঘটে।

৪০৪.১.১.২ : প্লেটোর ভাষাচর্চার নানাদিক

প্লেটো বা প্লাতোর (৪২৭-৩৪৭ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) রচনাতেই ভাষা সম্পর্কে গভীর তাত্ত্বিক জিজ্ঞাসা ও বৈয়াকরণিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। প্লাতো রচিত 'Dialogues' গ্রন্থের ক্রাতুলোস ও সফিস্ট অধ্যায়ে ভাষা জিজ্ঞাসার নানা সম্ভাবনার কথা রয়েছে। এট গ্রন্থ থেকেই ধ্রুপদী গ্রিক যুগের শব্দ ব্যুৎপত্তি ও ভাষাতাত্ত্বিক বিভিন্ন ধারণার কথা জানা যায়। ব্যাকরণের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে তিনিই প্রথম পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন বলে সমালোচক মনে করেন। ব্যাকরণের মধ্যে যে প্রভূত সম্ভাবনা নিহিত আছে সেই সম্ভাবনার বিষয়ে প্লাতোই প্রথম অনুসন্ধান করেছিলেন। পবিত্র সরকার শৈলির আলোচনায় শৈলি বলতে ব্যাকরণের অনন্ত সম্ভাবনার কথা বলেছেন। তার পূর্বাভাষ প্লাতোর বক্তব্যেই নিহিত। ক্রাতুলোস অধ্যায়ে তিনি শব্দের উৎসের কথা বলেছেন। তাঁর মতে, অধিকাংশ শব্দের সৃষ্টি হয়েছে স্বাভাবিক ভাবে, প্রকৃতি জগত থেকে। শব্দ ভাষা ব্যবহারকারীর থেকে স্বাধীন।

সমাসবদ্ধ পদ নিয়ে তিনি তাঁর যুক্তি সাজান। সম্পূর্ণ শব্দটির অর্থ নির্ভর করে শব্দ- শৃঙ্খলের উপর। অবশ্য প্রথার ভূমিকাকে তিনি অস্বীকার করেননি। এখান থেকেই ভাষার একটি মূল সমস্যা তিনি উদ্‌ঘাটন করেছেন। ভাষার যে-সব ভাব বা বস্তুকে প্রকাশের জন্য নানা ধ্বনিসমষ্টি বা নামশব্দ ব্যবহার করি সেইসব ভাব বা বস্তুর সঙ্গে ওইসব ধ্বনির কোন অপরিহার্য যোগ আছে কিনা, ভাষাজিজ্ঞাসার এটি একটি মূলীভূত সমস্যা। এই সমস্যাকে কেন্দ্র করে দুটি বিরোধীপক্ষ গড়ে ওঠে। যাঁরা বলেন অর্থের সঙ্গে ধ্বনির, বস্তুর সঙ্গে তার নামের অপরিহার্য সাদৃশ্য আছে তাদের বলা হয় সাদৃশ্যবাদী (Analogist)। আর যাঁরা বলেন এরকম কোন সাদৃশ্য নেই, ভাব বা বস্তুর যে-কোনো নাম আমরা খেয়ালখুশি অনুসারে দিয়ে থাকি,তাদের বলে খেয়ালখুশিবাদী (Anomalist)। ভাষা সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন বলেই এই সমস্যাটি ধরতে পেরেছিলেন তিনি।

প্লেটো 'সফিস্ট' অধ্যায়ে মানুষের চিন্তাশক্তির সঙ্গে ভাষার অপরিহার্য যোগের কথা উল্লেখ করে বলেছেন-চিন্তা (Thought) মানবাত্মার নিজের সঙ্গে নিজের নীরব কথোপকথন অর্থাৎ ধ্বনিহীন স্বগত সংলাপ। আর ধ্বনির সাহায্যে চিন্তা থেকে যে প্রবাহটি আমাদের মুখ নিঃসৃত হয় তাই হলো ভাষা (Logos)। 'ক্রাতুলোস' অধ্যায়ে তিনি গ্রিক ধ্বনিগুলির শ্রেণিবিভাগ করেন, ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে বিশ্লেষণ করেন। অঘোষ, ঘোষ এবং মহাপ্রাণ-এই তিন ধ্বনিতাত্ত্বিক শ্রেণিতে ব্যঞ্জনবর্ণগুলিকে বিভক্ত করেন। বর্তমানেও এই শ্রেণিবিন্যাস প্রচলিত আছে। 'থিয়েটেটাস' গ্রন্থে তিনি বলেন 'মতবাদ তৈরি করা' হল কথা বলা আর 'মতবাদ' হলো নীরবে নিজের সঙ্গে কথা বলা। জোরে বলা বা অন্যকে বলা নয়।

প্লেটো ভাষাচিন্তার প্রথম যুগে সক্রেটিসের মুখে (থেরায়তেতুস গ্রন্থে) ভাষার সংজ্ঞা দিয়েছেন- "'ওনোমাতা' ও 'রেমাতা'-এর মাধ্যমে মানুষের চিন্তার প্রকাশ।" (শিশিরকুমার দাশ, ভাষাজিজ্ঞাসা, প্যাপিরাস, ১৪২৪, পৃ ৫৪) 'ওনোমাতা' ও 'রেমাতা' শব্দদুটি 'ওনোমা' ও 'রেমা' শব্দের বহুবচন। এই শব্দ দুটি গ্রিকভাষায় নানা অর্থে ব্যবহৃত হলেও মোটামুটি বিশেষ্য ও ক্রিয়া অর্থেই আমরা গ্রহণ করতে পারি। প্লেটোর মতে ওনোমা ও রেমার সংযোগে গড়ে ওঠে বাক্য বা লোগোস। এ যুগের সমালোচক ওনোমা ও রেমার পার্থক্য নিরূপণ করেছেন অর্থগত দিক

থেকে, আকারগত দিক থেকে নয়। বরং আমরা এই শব্দদুটি (Logical Subject) ও (Logical Predicate) এর প্রতিশব্দরূপে ধরতে পারি। তাই তাঁর শ্রেণিবিভাগ গঠনগত না হয়ে অর্থভিত্তিক হয়েছে।প্লেটো ভাষা সম্পর্কে নানা কৌতূহল প্রকাশ করলেও ভাষাতাত্ত্বিক চিন্তার সূত্রপাত করেননি। ভাষা সম্পর্কে পৃথক কোনো গ্রন্থ নয়, অন্যান্য বিষয় আলোচনাসূত্রে ভাষার কথা এসেছে।

৪০৪.১.১.৩ : অ্যারিস্টটলের ভাষাচর্চার ইতিবৃত্ত

অ্যারিস্টটল (৩৮৪ খ্রি: পূ:-৩২২ খ্রি: পূ:) প্লেটোর ছাত্র, শিষ্য। অ্যারিস্টটল বুদ্ধিমান, মৃদুভাষী, ভদ্র, মার্জিত, মানসিক স্থৈর্যযুক্ত, দার্শনিক, যুক্তিবাদী। বিদ্যাচর্চার সমস্ত স্তরে তাঁর প্রবল আগ্রহ। প্লেটোর ছাত্র, শিষ্য হলেও তাঁর মতবাদ অ্যারিস্টটল সবক্ষেত্রে মানেননি। তাঁর ভাষা আলোচনা তত্ত্বপ্রধান নয়, তথ্যপ্রধান। ভাষায় অন্তরঙ্গভাব নয়, বহিরঙ্গ গঠন। তাঁর পোয়েটিক্স (poetics, পেরিপোইএতিকাস, on the art of poetry) গ্রন্থের ২০, ২১, ২২ তম অধ্যায়ে ভাষাসম্পর্কিত নানা দিকের সন্ধান আছে। যদিও ১৯তম অধ্যায়ে (রীতি ও অভিপ্রায়) ভাষা ব্যবহারের নানা বৈচিত্রের কথা বলা হয়েছে। ২০তম অধ্যায়ের শিরোনাম 'ভাষাবিচারের প্রাথমিক সূত্র'। ভাষারীতির অঙ্গ হিসাবে অ্যারিস্টটল আটটি অংশের কথা বলেন-বর্ণ (Letter), দল (Syllable), সংযোজক (conjunction),আরথ্রোন (Article), বিশেষ্য (Noun), ক্রিয়া (verb), কারক (case), আর পদগুচ্ছ (Sentence)। ভাষারীতির অঙ্গগুলির মধ্যে ক্ষুদ্রতম উপাদান বর্ণ এবং বৃহত্তম উপাদান পদগুচ্ছ বা বাক্য। ক্রমশ ক্ষুদ্রতম উপাদান থেকে বৃহত্তম উপাদানের দিকে ভাষার অঙ্গগুলিকে বিন্যস্ত করেছেন। তাঁর মতে বর্ণ হল অবিভাজ্য ধ্বনি বা supra-segmental sound। প্রত্যেক ধ্বনি বর্ণ নয়। কিন্তু যারা পরস্পর মিলে অর্থময় ধ্বনি তৈরি করতে পারবে তারাই বর্ণ।

ধ্বনিকে তিনি তিন শ্রেণিতে ভাগ করেছেন- স্বর, অর্ধস্বর ও ব্যঞ্জন। প্রতিটি শ্রেণির সংজ্ঞাও প্রদান করেছেন। মুখের অবস্থানগত বিভিন্নতা এবং বিভিন্ন স্থানবিশেষ থেকে নির্গত হবার উপর বর্ণগুলির পার্থক্য নির্ভরশীল। কখনও অল্পপ্রাণ কখনও মহাপ্রাণ, কখনও দীর্ঘ, কখনও হ্রস্ব, কখনও তাদের শ্বাসাঘাত সূক্ষ্ম, কখনও তীব্র, কখনও মধ্যবর্তী। দল, সংযোজক, আরথ্রোন, বিশেষ্য, ক্রিয়া, পদগুচ্ছ প্রতিটি অংশের পৃথক পৃথক সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। ২১তম অধ্যায়ের শিরোনাম 'কবিভাষা'। এখানে দু'রকম বিশেষ্যের কথা বলেছেন-সরল ও যুক্ত বিশেষ্য। "সরল বিশেষ্য বলতে বোঝায় সেইসব নামশব্দ যাদের অংশগুলির নিজস্ব কোনো অর্থ নেই (যেমন পৃথিবী)। যুক্ত বিশেষ্য হল তারা, যাদের একটি বা দুটি অংশের নিজস্ব মানে আছে, যদিও যুক্ত হবার পর তাদের নিজস্ব মানে আর বজায় থাকে না।" (কাব্যতত্ত্ব অ্যারিস্টটল, অনুবাদ শিশিরকুমার দাশ, প্যাপিরাস, ২০০৩, পৃঃ ৭৭)

বিশেষ্যগুলি হয়-

পরিচিত শব্দ

অপরিচিত শব্দ

রূপক শব্দ

অলঙ্কৃত শব্দ

সৃষ্ট শব্দ

দীর্ঘীকৃত শব্দ

সংক্ষেপিত শব্দ

পরিবর্তিত শব্দ সহযোগে।

পরিচিত শব্দ ব্যবহার করে সকলেই, কেউ কেউ অল্প পরিচিত শব্দ ব্যবহার করে। প্রতিটি পৃথক পৃথক শব্দের ব্যাখ্যা দেন তিনি। এই অধ্যায়েরই 'বিশেষ্যের লিঙ্গ' শিরোনামাঙ্কিত অংশে বিশেষ্যগুলির লিঙ্গগত শ্রেণিবিভাগ করেন। বিশেষ্যগুলির মধ্যে কেউ কেউ পুরুষবাচক, কেউ কেউ স্ত্রীবাচক, আর কতক আছে ক্লীবতাবাচক। প্রতিটি লিঙ্গবাচক শব্দের পদান্তিক চিহ্নের কথা উল্লেখ করেছেন।

২২তম অধ্যায়ের শিরোনাম 'রচনারীতি'। রচনারীতির আলোচনায় অ্যারিস্টটল শুধু শব্দ নির্বাচন ও শব্দ ব্যবহারের ওপরই জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে রচনার প্রথম গুণই হল স্পষ্টতা। কিন্তু বিশিষ্টতাহীনতা নয়। তাই রচনায় মিশ্র রীতির কথা বলেছেন। একদিকে অচলিত, রূপক, অলঙ্কৃত শব্দ ব্যবহারের ফলে রচনা প্রাত্যহিকতা ও সাধারণত্বের উর্ধ্বে উঠতে পারবে, অন্যদিকে প্রচলিত শব্দ দিতে পারবে স্পষ্টতা। যেকোনো রচনার পক্ষেই প্রয়োজন আতিশয্যহীনতা।

অ্যারিস্টটল ভাষার শব্দার্থের উৎস হিসাবে প্রথানুসারী মতবাদকেই সমর্থন করেন। তিনি মানুষের মুখের ভাষার গঠন ব্যাখ্যা করেন। তা ছিল মূলত যুক্তিনির্ভর ব্যাখ্যা। যুক্তিশাস্ত্র থেকে তিনি সরাসরি subject, predicate, Copula প্রভৃতি পরিভাষা গ্রহণ করেন। লজিক গ্রন্থে যুক্তিবিদ্যা আলোচনায় তিনি ভাষা নিয়ে এবং ভাষা অধ্যয়নের উন্নত পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেন। ক্যাটেগোরিস গ্রন্থে তিনি univocal words, equivocal words বলতে কী বোঝায় তার সংজ্ঞা দেন। তিনি দুভাবে মুখের ভাষাকে ভাগ করেছিলেন-ক. মুখের ভাষা সরল হবে অর্থাৎ গঠন ছাড়া কেবল শব্দ হবে। খ. মুখের ভাষা গঠনযুক্ত হবে।তিনি বাক্যগঠন বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য এবং বিধেয়-এই দুই ভাগে ভাগ করেন। কোনো কিছু সম্পর্কে সম্মতি বা অসম্মতি জানালে তা উদ্দেশ্য হয়।

অ্যারিস্টটল বললেন, শব্দগুলি মনের চিন্তাভাবনার প্রতীক। লিখিত শব্দ মৌখিকশব্দের প্রতিলিপি। জাতিতে জাতিতে মুখের ভাষা এবং লিখিত ভাষা পৃথক। কিন্তু শব্দগুলি যে মনের ভাবনার প্রতীক, সেই মন বিশ্বগত। মনের চিন্তাগুলি কখনও সত্য কখনও অসত্য ; তেমনই মানুষের ভাষা। কিন্তু শব্দে সংযুক্ত হয়ে প্রকাশিত হবার আগে পর্যন্ত তারা না-সত্য, না-অসত্য। অ্যারিস্টটলের মতের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল শব্দ ও অর্থের সম্পর্ক। তিনি বলছেন, শব্দের কোনো নিজস্ব অর্থ নেই। যে ধ্বনিগুলি আমাদের কণ্ঠ থেকে নির্গত হচ্ছে তাদের কোনো দৃশ্য, স্পৃশ্য বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ নেই, কোনো প্রতিবিম্ব নেই বস্তুজগতে। যেমন- ঘৃণা, সুন্দর, পবিত্রতা, ভালোবাসা ইত্যাদি শব্দগুলির কোনো দৃশ্য বা প্রতিবিম্ব নেই। সংযোজক শব্দের প্রয়োগের কথা, দু-রকম উক্তির কথা নানা বিষয় নিয়ে তিনি আলোকপাত করেন। ব্যাকরণ তথা ভাষাচর্চার অনেকটা পরিপূর্ণ রূপ তাঁর হাত ধরে গড়ে উঠেছিল।

৪০৪.১.১.৪ : দিওনুসিয়স থ্রাক্সের ব্যাকরণচর্চা

অনেকেই দিওনুসিয়স বা দিয়োনিসিউস থ্রাক্স (১৭০-৯০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)-কে ইউরোপের প্রথম সার্থক বৈয়াকরণ বলেছেন। রোমান ছাত্রদের গ্রিক শেখানোর জন্য থ্রাক্স গ্রিক ভাষায় তেখনে গ্রামাটিকে (Tekhne grammatike)

নামক ব্যাকরণ গ্রন্থ লেখেন। গ্রন্থটি পঁচিশটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম on Grammer। এই অংশে তিনি ব্যাকরণের ছয়টি ভাগের কথা বলেছেন-

ক. ছন্দ বজায় রেখে অনুশীলিত পাঠ

খ. কাব্যিক অলঙ্কারের ব্যাখ্যা

গ. ঔপভাষিক বৈচিত্র্য ও পূর্বসূত্র উল্লেখ

ঘ. Discovery of Etymology বা শব্দ-ব্যুৎপত্তি আবিষ্কার

ঙ. সাদৃশ্যগুলি যথাযথ নির্ণয় করা

চ. কাব্যিক পাঠের সমালোচনা

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'On Reading'। কোনোরকম ইতস্তত না করে গদ্য বা পদ্য ছন্দ মাত্রা বজায় রেখে পাঠ করার কথা বলেন। অর্থ ও বিরতি অনুযায়ী পাঠ করার কথা তিনি বলেন। ট্রাজেডি, কমেডি, শোককবিতা, মহাকাব্য, গীতিকবিতা, বীরগাথা কীভাবে পাঠ করতে হবে সেকথা উল্লেখ করেছেন। চতুর্থ অধ্যায়ে সুরের যথাযথ প্রয়োগের কথা বলেন। কণ্ঠস্বরের সুরসংগতিময় ধ্বনিঝংকারকে তিনি সুর বলেছেন। 'On Pronunciation' নামক অধ্যায়ে তিন প্রকার বিরতি চিহ্নের কথা বলেন-ফুলস্টপ, সেমিকোলন আর কমা। তাদের সংজ্ঞাও প্রদান করেছেন। ফুলস্টপ কি কমা থেকে আলাদা? সেই প্রশ্ন তিনি রেখেছেন। Rhapsody অধ্যায়ে মহাকাব্যের সংজ্ঞা দিয়েছেন। হোমারের মহাকাব্য পাঠ অনুষঙ্গ স্থান পেয়েছে। On Element নামক সপ্তম অধ্যায়ে চব্বিশটি (২৪) বর্ণের কথা বলেছেন। সাতটি (৭) স্বরবর্ণ এবং সতেরোটি (১৭) ব্যঞ্জনবর্ণ। সাতটি স্বরবর্ণের দুটি দীর্ঘস্বর, দুটি হ্রস্বস্বর। বাকি তিনটি সন্দেহজনক অর্থাৎ কখনও হ্রস্ব কখনও দীর্ঘ উচ্চারিত হয়। পাঁচটি স্বরধ্বনি prepositive। এরা অক্ষর গঠন করে। দুটি Subjunctive অর্থাৎ সংযোজক হিসাবে বসে। ছয়টি যৌগিক স্বর আছে। সতেরোটি ব্যঞ্জনের আটটি (৮) অর্ধস্বর। বাকি ন'টি (৯) স্বরহীন বা mute। এর তিনটি মসৃণ, তিনটি কর্কশ, তিনটি মধ্যবর্তী ধ্বনি।

Syllable বা অক্ষর আলোচনায় long, short, common এই তিন শ্রেণিতে অক্ষরকে বিভাজিত করেছেন। শব্দের সংজ্ঞায় তিনি বাক্যের ক্ষুদ্রতম উপাদান হিসাবে শব্দকে গণ্য করেছেন। শব্দের সমন্বয়ে গঠিত হয় বাক্য। বাক্যের অংশ পদ বা parts of speech আট (৮) প্রকার। যথা noun, verb, participle, articles, pronoun, preposition, adverb, conjunction। 'On the Noun' অংশে বিশেষ্যের তিনটি ভাগের কথা বলেন-proper, common এবং abstract। তিন ধরণের লিঙ্গ। গণ বা প্রজাতি দু ধরণের। প্রকার তিন ধরণের। বচন তিনপ্রকার-একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন। কারক পাঁচ প্রকার-বিশেষ্যের বিভিন্ন মানদণ্ড অনুযায়ী রূপতাত্ত্বিক বিভাজন করেছেন। On the Verb অধ্যায়ে ক্রিয়ার ভাব, বাচ্য, প্রজাতি, প্রকার, বচন, পুরুষ, ক্রিয়ার কাল বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে। অন্যান্য পদগুলি নিয়েও তাঁর ব্যাখ্যা আছে। থ্রাক্স তাঁর ব্যাকরণকে ভাষা ব্যবহারের নিরীক্ষামূলক জ্ঞান বা experimental knowledge হিসাবে দেখেছেন। তাঁর ব্যাকরণ প্রথম নিয়মানুগ ব্যাকরণ। রোম সাম্রাজ্যে দীর্ঘদিন এই ব্যাকরণ স্কুলপাঠ্য ছিল। তবে রূপতত্ত্বের আলোচনা এলেও বাক্যতত্ত্বের আলোচনা সেভাবে স্থান পায়নি। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ হিসাবে গ্রন্থটি সর্বজনবিদিত।

৪০৪.১.১.৫ : দুসকোলোস ও হেরোদিয়ানুসের ভাষাচর্চার মূলসূত্র

খ্রিষ্টিয় দ্বিতীয় শতকে গ্রিকভাষী বৈয়াকরণ অ্যাপোলোনিউস দুসকোলোস-এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি তিরিশটির বেশি পুস্তিকা যথা syntax, semantics, morphology, prosody, orthography, dialectology প্রভৃতি রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়। On Syntax চারটি খণ্ডে বিভক্ত। তিনিই প্রথম বাক্যতত্ত্ব সম্পর্কে বিধিবদ্ধ আলোচনা করেন। আধুনিক অন্বয়-চিন্তার জনক বলা হয় তাঁকে। তিনি ব্যাকরণকে যুক্তিনিষ্ঠ ও নিয়মদ্বারা পরিচালিত বলে মনে করেন। বাক্যের সব স্তরে মগ্ন গঠন আছে বলে মনে করতেন। article, pronoun, verb, participle, preposition, adverb নিয়ে আলোচনা করেন বিভিন্ন খণ্ডে।

থ্রাক্সের মতোই পদের আটটি (৮) ভাগ করেন। তারসঙ্গে নতুন করে দার্শনিক পরিভাষা ও সংজ্ঞা ব্যবহার করেন। প্রতিটি শব্দের শ্রেণি নির্ধারণের ক্ষেত্রে তিনি দার্শনিক ব্যাখ্যা দেন। তিনি form বা গঠনরূপ এবং Meaning বা অর্থকে আলাদা হিসাবে দেখেছেন। বিশেষ্যধর্মী ও ক্রিয়াধর্মী বাক্যের গঠন যে আলাদা, তা তিনি দেখিয়েছেন। বাক্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিশেষ্য ও ক্রিয়া-এই দুটিকে লক্ষ্য করেছেন। আর অন্য পদগুলি এদের অনুসারী। ক্রিয়াকে লাতিন ভাষার ব্যাকরণ অনুযায়ী বিশ্লেষণ করেন, শ্রেণিবিভাগ করেন। দুসকোলস-এর পুত্র হেরোদিয়ানুসও ব্যাকরণবিদ ছিলেন। তিনি শ্বাসাঘাতের নিয়ম, ধ্বনিতত্ত্ব, বিরামবিধি সম্পর্কে আলোকপাত করেন। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে ধ্বনির ছন্দগুণ ও অবিভাজ্য স্বনিমের অন্তর্গত শ্বাসাঘাত সম্পর্কে আলোচনা করেন। এভাবে গ্রিক ব্যাকরণ পূর্ণতা পায়।

৪০৪.১.১.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। প্রথম যুগের গ্রিক ব্যাকরণ রচয়িতা প্লেটোর ব্যাকরণের মূলসূত্র সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো।

২। ভাষাচর্চার ইতিহাসে অ্যারিস্টটলের কৃতিত্ব নিরূপণ করো।

৩। 'তেখনে গ্রামাতিকে' অবলম্বনে দিওনুসিয়াস থ্রাক্সের ব্যাকরণের বিশিষ্টতা চিহ্নিত করো।

৪। গ্রিস দেশের ভাষাচর্চার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত করো।

পত্র : ডিএসই-৪০৪

বিশেষ পত্র : ভাষাতত্ত্ব

পর্যায় গ্রন্থ : ১

একক-২

প্রাচীন রোম দেশে ভাষাতত্ত্ব চর্চা

বিন্যাসক্রম :

৪০৪.১.২.১ : ভূমিকা

৪০৪.১.২.২ : মার্কাস টেরেন্টিয়াস ভারোর ভাষাচর্চা

৪০৪.১.২.৩ : মার্কাস ফেবিয়াস কুইন্তিলিয়ানুসের ভাষাচর্চার নানাদিক

৪০৪.১.২.৪ : দোনাতুস ও বোয়েথিউস-এর ভাষাচর্চার মূলসূত্র

৪০৪.১.২.৫ : প্রিস্কিয়ান-এর ভাষাতত্ত্বের সূত্র অনুসন্ধান

৪০৪.১.২.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৪০৪.১.২.৭ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৪০৪.১.২.১ : ভূমিকা

পাশ্চাত্যে বিধিসম্মতভাবে ভাষাতত্ত্ব চর্চার সূত্রপাত হয় প্রাচীন গ্রিস দেশে। প্লেটো, অ্যারিস্টটল, থ্রাক্স, দুসকোলোস, হেরোদিয়ানুস গ্রিক ব্যাকরণকে একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামো দেবার প্রয়াসী হয়েছেন। কিন্তু তাঁদের ভাষাতত্ত্ব চর্চায় কিছু সীমাবদ্ধতা চোখে পড়ে। যথা—

ক. তাঁদের ভাষাদৃষ্টি গ্রিক ভাষাতেই সীমাবদ্ধ ছিল।

খ. ভাষাদৃষ্টি বৈজ্ঞানিক নয়, দার্শনিক, তর্কশাস্ত্রের Syllogism থেকে গৃহীত অর্থাৎ দু-একটি বক্তব্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছেন।

গ. তাঁদের ব্যাকরণে উল্লিখিত দৃষ্টান্তের ভাষা কবি ও গদ্যকারের ব্যবহৃত ভাষা, জীবন্ত মানুষের মুখের ভাষা নয়।

সেই সীমাবদ্ধতা দূরীকরণে সচেষ্ট হয়েছেন রোম দেশের ভাষাবিদ তথা ব্যাকরণবিদ। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত সময় পর্বে গ্রিস রোমের অধীনে চলে এলেও সাংস্কৃতিক দিক থেকে গ্রিকরাই রোমের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। গ্রিসের একজন বৈয়াকরণ ক্রাতেস খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে রোম ভ্রমণে এসে অসুস্থ হয়ে দীর্ঘকাল থেকে যান। তাঁর ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কিত প্রদত্ত বক্তৃতা থেকে রোমানরা গ্রিক ভাষা সম্পর্কে জানতে পারেন এবং গ্রিক ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। লাতিন ব্যাকরণবিদগণ শিক্ষিত হয়েছিলেন গ্রিক আদর্শে। ব্যাকরণ রচনা তথা প্রণয়নেও গ্রিক আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হন। ভারো, কুইন্তিলিয়ানুস, দোনাতুস, প্রিস্কিয়ানুস, বোয়েথিউস রোমের ব্যাকরণ চর্চাকে পূর্ণতর রূপ দিতে প্রয়াসী হন।

৪০৪.১.২.২ : মার্কাস টেরেন্টিয়াস ভারো (১১৬-২৭ খ্রিস্টপূর্ব)

ভারোকে রোম দেশের সর্বোত্তম শিক্ষিত ব্যক্তিত্ব বলে অনেকে মনে করেন। কবিতা, দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য সমালোচনা, ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব, বিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র-সর্ব বিষয়ে তিনি পারদর্শী। ভারো তিন ধরনের গদ্যকর্ম নিয়ে কাজ করলেন-পুরাকীর্তি বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গদ্য রচনা, বৈয়াকরণ ও ভাষাতাত্ত্বিকদের ব্যাকরণ শাস্ত্র নিয়ে কাজ এবং প্রয়োগমূলক বিষয় নিয়ে কাজ। তাঁর গ্রন্থগুলি সে সময়কার শৈলী নির্ণায়ক হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাঁর ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ De Lingua Latina (on the Latin Language)। গ্রন্থটি ২৫টি (পঁচিশটি) Books তথা বই নিয়ে রচিত। এটি লাতিন ভাষায় ভাষা বিষয়ক শাস্ত্র হিসেবে রচিত। তাঁর গ্রন্থে উল্লেখিত বক্তব্য বিষয় থেকে মূল দিকগুলি সূত্রাকারে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

- শব্দ নির্মাণের পদ্ধতি, শব্দ বিষয়বস্তু ও ভাবের সঙ্গে কীভাবে যুক্ত হল তা নিয়ে আলোচনা আছে।
- শব্দের ব্যুৎপত্তি ও শব্দ বুৎপত্তির প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেন।
- শব্দের উৎস, প্রকৃতি, নতুন শব্দ নির্মাণ, কাব্যে প্রাপ্ত বিরল ও দুরূহ শব্দ নিয়ে আলোকপাত করেন।
- বিশেষ্য, ক্রিয়া, ক্রিয়ার কাল সম্পর্কে আলোচনা করেন। সাদৃশ্য নিয়ে অনেকগুলি বই-এ তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সাদৃশ্য ব্যবহারে ইতিবাচক মনোভাবনায় উপনীত হন।
- নানা কারকে শব্দের ব্যবহার নিয়ে তাঁর মতামত বিস্তার করেন। বিভক্তিগত বৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গে জানান, উপভাষা এবং মান্য ভাষার ক্ষেত্রে বিভক্তি প্রায় একই।
- বাক্যতত্ত্ব তথা Syntax নিয়েও তাঁর সিদ্ধান্তের হদিস পাওয়া যায়।
- স্থান আর সময় এই দুটি বিষয়কে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন তিনি।

৪০৪.১.২.৩ : মার্কাস ফেবিয়াস কুইন্তিলিয়ানুস (৩৫-১০০ খ্রিস্টাব্দ)

তাঁর গ্রন্থের নাম Institutio Oratoria (Institutes of Oratory) অলংকারশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থটি বারোটি খন্ডে বিভক্ত। এটি একটি টেক্সটবুক তথা পাঠ্যগ্রন্থ। আদর্শ কথা বলাকে তিনি গুরুত্ব দেন। কথা বলার শৈলীর দিকটি তিনি আলোচনা করেন। গ্রন্থটিতে বক্তৃতা, কাব্যতত্ত্বের সঙ্গে ব্যাকরণ নিয়ে আলোচনা আছে। লাতিন কারক পদ্ধতি নিয়ে তিনি বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেন। তিনি অপাদান কারকের মধ্যে করণকারকের মতো ব্যবহার হয় এমন রূপগুলিকে আলাদা কারক হিসাবে রাখতে চেয়েছেন। করণকারককে সপ্তম কারক হিসাবে পৃথক করে দেখতে

চান। প্রকৃতপক্ষে যাকে করণকারক হিসাবে আলাদা করতে চেয়েছেন তা আসলে অপাদান কারকের শব্দার্থ-বৈচিত্র্য ছাড়া আর কিছু নয়।

৪০৪.১.২.৪ : দোনাতুস

তাঁর গ্রন্থের নাম Ars Grammatica-এর দুটি অংশ-Ars Minor এবং Ars Major. Ars Minor-এ Parts of Speech বা পদসম্পর্কে আলোকপাত করেন এবং Ars Major-এ ব্যাকরণের সাধারণ ধারণা আছে। দোনাতুস প্রাচীন ও মধ্যযুগের Punctuation বা যতি চিহ্নের প্রবক্তা। 'Dots' যতি চিহ্নটির মধ্য দিয়ে তিনটি পৃথক চিহ্নকে প্রকাশ করেন। কম বিরতি থেকে ক্রমশ বেশি বিরতির দিকে অগ্রসর হওয়া, আধুনিক যুগে যা চিহ্নিত হয় কমা (,) কোলন (;) এবং ফুলস্টপ (.) হিসাবে।

বোয়েথিউস তিনি প্রথাগত ব্যাকরণকে আরো প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ব্যাকরণ রচনা করেননি 'বিশ্বজনীনতার তত্ত্ব' অবতারণা করেন। মানবচিন্তার মধ্যে সমস্ত বিভিন্নতা সত্ত্বেও আমরা ভাষাগত ঐক্যসূত্র লক্ষ করি। ভাষা অনেক, তাদের মধ্যে পার্থক্য বিস্তর। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা সম্পূর্ণ পৃথক নয়, প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের সামান্য মিল আছে। তাই ভাষার আভ্যন্তরিক ক্রিয়ার যদি একটা মডেল বা আদর্শ কাঠামো তৈরি করা যায় তাহলে তা সমস্ত ভাষার পক্ষেই প্রযোজ্য হবে। সেই কাঠামোর ভিত্তিতে পৃথিবীর সব ভাষার ব্যাকরণ রচনা সম্ভব।

৪০৪.১.২.৫ : প্রিস্কিয়ানুস

গ্রীক আদর্শে রচিত লাতিন ব্যাকরণের চরম বিকাশ ঘটে প্রিস্কিয়ানুসের হাতে। ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব-তিনদিক থেকেই ক্লাসিক্যাল লাতিন ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন। থ্রাক্সের মতো তিনিও Parts of Speech-কে ৮টি পদে বিভক্ত করেন-Noun, Pronoun, verb, participle, Adverb, Preposition, Interjection, Conjunction। Article-কে বাদ দেন, Interjection সংযোজন করে পদবিভাগে পূর্ণতা আনেন। তাঁর গ্রন্থের নাম Institutes of Grammar (Institutions Grammatice) গ্রন্থটি ১৮টি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম ১৬টি খণ্ডকে প্রিস্কিয়ানুস মেজর এবং শেষ দুটি খণ্ডকে বলেছেন মাইনর। তাঁর ব্যাকরণগ্রন্থটি গ্রিক ব্যাকরণবিদ হেরোদিয়ানুস ও দুসকোলোসের ব্যাকরণকে সামনে রেখে রচিত। মধ্যযুগীয় স্কুলের ব্যাকরণ হিসাবে এটি ব্যবহৃত হয়। তাঁর ব্যাকরণকে বলা হয় Speculative Grammer or the Logic of Language। তাঁর অন্যান্য কাজ De nomine (Noun), Pronomine (Pronoun) et verbo (Verb)। তাঁর ল্যাটিন ব্যাকরণ এমনভাবে লেখা যেন তাঁর পাঠকরা সবাই গ্রিক ভাষা জানে। অসংখ্য গ্রিক উদাহরণ আছে। গ্রিক ভাষা ও লাতিন ভাষার তুলনা আছে। কীভাবে ভাষা ব্যবহৃত হয় তা না দেখিয়ে কীভাবে ভাষা ব্যবহার করা উচিত সে বিষয়ে নিয়মাবলী রচনা করেন।

ভারো, কুইন্তিলিয়ানুস, দোনাতুস, প্রিস্কিয়ানুস, বোয়েথিউস-এর ব্যাকরণ সম্পর্কিত নানান দিকের আলোচনার মাধ্যমে রোম দেশের ভাষাচর্চা পূর্ণতার পথে অগ্রসর হয়।

৪০৪.১.২.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। রোম দেশের ভাষাচর্চায় ভারোর কৃতিত্ব নিরূপণ করো।

২। কুইন্তিলিয়ানুসের ভাষাচর্চার প্রবণতাগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করো।

৩। প্রিস্কিয়ানুসের ব্যাকরণের বিশিষ্টতাগুলি চিহ্নিত করো।

৪। রোম দেশের ভাষাচর্চার ইতিহাস সংক্ষেপে তুলে ধরো।

৪০৪.১.২.৭ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। ড. নীলিমা চক্রবর্তী ড. উদয় কুমার চক্রবর্তী, ভাষাচর্চা ভাষাপ্রস্থান, ২০২২, শ্রীময়ী প্রকাশনী, কোলকাতা-১২৪

২। শিশিরকুমার দাশ, ভাষাজিজ্ঞাসা, ১৪২৪(ষষ্ঠ সং), প্যাপিরাস, কোলকাতা-০৪

৩। শিশিরকুমার দাশ, (অনুবাদ) কাব্যতত্ত্ব, অ্যারিস্টটল, ২০০৩ (তৃতীয় মুদ্রণ) প্যাপিরাস, কোলকাতা-০৪

৪। ড. রামেশ্বর শ' সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, ১৪০৩ (তৃতীয় মুদ্রণ), পুস্তক বিপণি, কোলকাতা-০৯

৫। বাংলা ভাষায় ব্যাকরণ, আনন্দবাজার পত্রিকা ব্যবহারবিধি, আনন্দ, ২০১৫

৬। মলয়া গঙ্গোপাধ্যায়, ভাষাচর্চার একাল সেকাল, ২০২০, আনন্দ

৭। Grammar of Dionysios Thrax, Translated by Thomas Davidson, ST. Louis, Mo. 1874

পত্র : ডিএসই-৪০৪

বিশেষ পত্র : ভাষাতত্ত্ব

পর্যায় গ্রন্থ : ২

জার্মানীর ও ইংল্যাণ্ডের ভাষাতত্ত্বচর্চা

একক-১

তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় জার্মানী

বিন্যাসক্রম :

৪০৪.২.১.১ : ভুমিকা

৪০৪.২.১.২ : ফ্রীদ্রিশ ফন শ্লেগেলের ভাষা বিশ্লেষণ

৪০৪.২.১.৩ : রাস্কের ভাষাবিজ্ঞান চর্চার নানান দিক

৪০৪.২.১.৪ : গ্রীমের সূত্র (Grimm's Law)

৪০৪.২.১.৫ : ফ্রীদ্রিশ পটও শ্লাইশারের ভাষা আলোচনার মূলনীতি

৪০৪.২.১.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৪০৪.২.১.৭ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৪০৪.২.১.১ : ভূমিকা

দেশ-কাল ভেদে ভাষা ক্রমপরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তন সূত্রে একাধিক ভাষার জন্ম। যখন একটি ভাষার সঙ্গে অন্যভাষার বা একটি ভাষাপরিবারের সঙ্গে অন্য একটি ভাষাপরিবারের ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক, বাক্যগঠনগত বৈশিষ্ট্যের তুলনা অথবা একই ভাষার অন্তর্গত উপভাষাগুলোর তুলনা করে তাদের উৎসভাষা বা মূল ভাষার পুনর্নির্মাণ করা হয়, সেই পদ্ধতিটি হল তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব (Comparative Philology)।

একাধিক ভাষার মধ্যে পারস্পরিক তুলনা এবং তাদের মূল ভাষার পুনর্নির্মাণ করার প্রবণতার মূলে আছে নবজাগরণ (Renaissance)। ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে এর নানা কারণ ছিল :

(ক) ভৌগোলিক অভিযান—নানা দেশে ইউরোপীয়দের ভৌগোলিক অভিযানের ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্র প্রসারিত হয় এবং একাধিক দেশের ভাষার সঙ্গে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের সংযোগ স্থাপিত হয়। ফলে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ভারতীয় ভাষা, বিশেষত সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে অবহিত হয়ে ওঠেন।

(খ) মুদ্রণযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা—বিভিন্ন দেশে মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হবার ফলে বিভিন্ন দেশের ভাষার ব্যাকরণ, অভিধান, ধর্মগ্রন্থ ও প্রাচীন সাহিত্য মুদ্রিত হতে থাকে। ফলে এক দেশের ভাষার লিখিত রূপ অন্যদেশের ভাষাজিজ্ঞাসুদের হস্তগত হয় এবং শুরু হয় তুলনামূলক চর্চা।

(গ) ধর্মপ্রচার—বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় পুস্তক রচনা আবশ্যক হয়। আর তখনই আসে তুলনামূলকতার প্রসঙ্গ।

(ঘ) একটি দেশের অধীনে আর একটি দেশে চলে আসার ফলেও শুরু হয় তুলনামূলক ভাষা অধ্যয়ন।

তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব অন্য শাখার চেয়ে অনেক বেশি বিজ্ঞানসম্মত,পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত। এই পদ্ধতিতে একাধিক ভাষা নিয়ে চর্চা হয় বলে সেই ভাষাগুলি সম্পর্কে গভীর ব্যুৎপত্তির প্রয়োজন। ভাষার উৎস সন্ধানে যাত্রা করতে গিয়ে জাতির ইতিহাস পুনরুদ্ধার করা তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের প্রধান উদ্দেশ্য।

১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সূত্রপাত করেছিলেন স্যার উইলিয়াম জোন্স (William Jones)। তিনি কলকাতার রয়্যাল এশিয়াটিক্ সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে একটি বক্তৃতায় বলেন—সংস্কৃত ভাষার প্রাচীনত্ব যাইহোক গঠনের দিক দিয়ে তা গ্রিকের চেয়ে সুসম্বন্ধ, ল্যাটিনের চেয়ে ঐশ্বর্যময়, আর উভয় ভাষার চেয়ে পরিশীলিত। এই তিন ভাষার ব্যাকরণের মধ্যে আশ্চর্য ঐক্য, মনে হয় ঐ তিনটি ভাষাই জন্ম নিয়েছে এক উৎস থেকে। মনে হয় একই উৎস হতে জন্ম হয়েছে প্রাচীন জার্মান, কেল্তিক এবং প্রাচীন পারসিক।—এই উক্তিটি ভাষাচর্চার ইতিহাসে স্মরণীয়। এই মন্তব্য ইউরোপের সুধীসমাজে আলোড়ন তোলে। পণ্ডিতেরা সংস্কৃতের সঙ্গে গ্রিক, ল্যাটিন, প্রাচীন জার্মান প্রাচীন স্লাভ ভাষার মিল লক্ষ করলেন। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্ৎস্ বপ্ সংস্কৃত, গ্রিক, ল্যাটিন, প্রাচীন জার্মান ও প্রাচীন পারসিক ভাষার ক্রিয়ার রূপগুলির তুলনামূলক আলোচনা করে গ্রন্থ লিখলেন। জন্ম হল এক নতুন শাস্ত্রের, যার নাম—তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব।

উইলিয়াম জোন্সের নেতৃত্বে এ ধারার সূচনা ভারতে হলেও তা পূর্ণ বিস্তারলাভ করেছিল জার্মানিতে। জার্মানির উল্লেখযোগ্য ভাষাতাত্ত্বিকের অবদান সংক্ষেপে আলোচনা করা হল :

৪০৪.২.১.২ : ফ্রীদ্রিশ্ ফন্ শ্লেগেল (Friedrich von Schlegel, 1772-1829)

জার্মানিতে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সূত্রপাত করেন ফ্রীদ্রিশ্ ফন্ শ্লেগেল। তিনিই প্রথম জার্মান ভাষায় তুলনামূলক ব্যাকরণ ('vergleichende Grammatik') কথাটি উল্লেখ করেন,পরে তা থেকে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের প্রচলন। তাঁর ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থটি হল 'On the Language and wisdom of the Indians' (১৮০৮)।

শ্লেগেল তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের মূলনীতি প্রবর্তন করেন। মূলনীতিটি হল বিভিন্ন ভাষায় আভ্যন্তরীণ গঠনের তুলনা করে বংশগত অভিন্ন উৎসের নির্দেশ দেওয়া। এদের ভাষার মধ্যে গভীর ব্যাকরণগত সাদৃশ্য রয়েছে।এই সাদৃশ্যের ভিত্তিতে ভাষাগুলির বংশগত ঐক্য প্রতিপন্ন করা যায়।

৪০৪.২.১.৩ : র‍্যাসমুস ক্রিস্টিয়ান রাস্ক্ (Rasmus Kristian Rask, 1787-1832)

শ্লেগেলের সমসাময়িক জার্মান ভাষাতত্ত্ববিদ্ ছিলেন রাস্ক্। তিনি তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব চর্চার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাষার শব্দকে ধ্বনিগত দিক দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন।আইস্ল্যাণ্ডিক ভাষার উৎস সন্ধান বিষয়ক তাঁর গবেষণা গ্রন্থ—'Investigation of the Origin of the Old Norse or Icelandic Language'।

রাস্ক্ তাঁর এই গ্রন্থে জার্মানিক ভাষার ধ্বনি এবং ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের অন্যান্য শাখার ভাষায় ধ্বনির মধ্যে নিয়মিত বিধিবদ্ধ পার্থক্যের কথা প্রথম প্রকাশ করেন। তিনি ভাষার রূপগুলির তুলনামূলক বিশ্লেষণের দিকে যেমন প্রাধান্য দিয়েছেন তেমনি ধ্বনিবিজ্ঞানগত রূপকে বিশ্লেষণ করেছেন। ধ্বনির সাদৃশ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভাষাতাত্ত্বিক সম্পর্ক নির্ণয় করার কথা বলেছেন। তাঁর লেখা থেকে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি স্পষ্ট বোঝা যায়। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার অন্যান্য শাখায় 'p' (প্), জার্মানিক শাখায় 'f' (ফ্) হয়। তেমনি বাংলায় 'পাঁচ' (প্), ইংরেজিতে (পশ্চিম জার্মান) 'Five' (ফ্), সংস্কৃতে 'পিতৃ' (প্), গ্রীকে 'পতের্' (প্), লাতিনে 'pater' (প্),জার্মানিক শাখার গথিকে 'fadar' (ফ্) হয়।

৪০৪.২.১.৪ : য়াকপ্ গ্রীম্ (Jacob Grimm, 1785-1863)

তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব চর্চায় য়াকপ্ গ্রীম্ রাস্কের ধ্বনি পরিবর্তনকে সূত্রবদ্ধ করেন, নাম হয় গ্রীমের সূত্র (Grimm's Law) আর এই ধ্বনি পরিবর্তনের নাম দেন—Germanic Sound-shift। ১৮১৯ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর জার্মান ব্যাকরণ গ্রন্থ—'*Deutsche Grammatik*' (ডয়ট্শে গ্রামাটিক)।

গ্রীমের এই গ্রন্থ শুধু জার্মান ভাষার ব্যাকরণ নয়, জার্মানিক শাখার ভাষা গথিক, স্ক্যাণ্ডিনেভীয়, ইংরেজি, ফ্রীজীয়, ওলন্দাজ ও জার্মান ভাষার তুলনামূলক ব্যাকরণ। প্রতিপাদ্য বিষয়—মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা থেকে পৃথক হয়ে আসার সময় (৫০০ খ্রি. পূ.) জার্মানিক ভাষার যে পরিবর্তন হয়, তা অন্যান্য ভাষা থেকে স্বতন্ত্র। এই পরিবর্তন তিনটি ধারায় ঘটে—

(ক) মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার অল্পপ্রাণ সঘোষ স্পর্শধ্বনি জার্মানিক শাখায় অল্পপ্রাণ অঘোষ স্পর্শধ্বনিতে পরিণত হয়।

মূল ইন্দো-ইউরোপীয়	জার্মানিক
সঘোষ অল্পপ্রাণ স্পর্শবর্ণ—b d g	অঘোষ অল্পপ্রাণ স্পর্শবর্ণ—p t k

মূল ইন্দো-ইউরোপীয়	জার্মানিক
সংস্কৃত দশ—(d/দ্) গ্রিক—deka (d/দ্) লাতিন—decem (d/দ্)	গথিক—taihum (t/ত্)

(খ) মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার অল্পপ্রাণ অঘোষ স্পর্শধ্বনি জার্মানিক শাখার ভাষায় মহাপ্রাণ অঘোষ উষ্মধ্বনিতে পরিণত হয়।

মূল ইন্দো-ইউরোপীয়	জার্মানিক
অল্পপ্রাণ অঘোষ স্পর্শবর্ণ—p t k k^w	মহাপ্রাণ অঘোষ উষ্মধ্বনি—f o x x^w
সংস্কৃত পিতৃ—(p/প্) গ্রিক—pater (p/প্) লাতিন—pater (p/প্)	গথিক—fadar (f/ফ্)

(গ) মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার সঘোষ মহাপ্রাণ স্পর্শধ্বনি জার্মানিক শাখার ভাষায় সঘোষ অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনিতে পরিণত হয়।

মূল ইন্দো-ইউরোপীয়	জার্মানিক
সঘোষ মহাপ্রাণ স্পর্শধ্বনি—bh dh gh	সঘোষ অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনি—b d g
সংস্কৃত ভ্রাতা (bh/ভ্)	ইংরেজি—brodor (b/ব্)

—এই তিনটি পরিবর্তন First Sound shift। Second Sound-shift or High German Sound-shift-এ হাইজার্মান উপশাখাকে পশ্চিম জার্মানিক উপশাখা থেকে পৃথক করে দেয়। পশ্চিম জার্মানিক ভাষার স্বরমধ্যবর্তী পদ, মধ্যস্থ বা পদান্তিক p t k হাই জার্মানিক শাখায় দ্বিত্বপ্রাপ্ত হয়ে উষ্মধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন—পশ্চিম জার্মান open কিন্তু হাই জার্মানে offan। গ্রীমের ধ্বনিপরিবর্তনের কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করে নতুন সূত্র প্রবর্তন করেন গ্রাসম্যান ও ভের্ণার।

৪০৪.২.১.৫ : আউগুস্ট ফ্রীদ্রিশ্ পট্ (August Friedrich Pott, 1802-1887)

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে জার্মানিতে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের একজন ভাষাবিদ্ হলেন আউগুস্ট ফ্রীদ্রিশ্ পট্। তিনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের সূত্রপাত করেন। ১৮৩৩ সালে প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থ—'Etymological Investigations'।

এটি ব্যুৎপত্তিগত অনুসন্ধান বিষয়ক তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ। তিনি শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করতে গিয়ে তার প্রাচীনতম রূপটি আবিষ্কার এবং সেই প্রাচীনতম রূপের সঙ্গে সমসাময়িক অন্যান্য ভাষার রূপগুলি নির্ণয় করেছেন। এর ফলে সহোদর স্থানীয় শব্দগুলিকে চিনতে সুবিধা হয়। যেমন—সিন্ধী 'মাউ',পাঞ্জাবী 'মাঁউ', অসমিয়া 'মা', 'মাউ', বাংলা

'মা', ওড়িয়া 'মাআ', 'মা', মৈথিলি-ভোজপুরি-অবধি 'মাঈ', হিন্দি 'মা', মারাঠি 'মা', 'মাঈ'—ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের সাহায্যে জানা যায় এরা সহোদর স্থানীয় ভাষা কিনা। এছাড়া তিনি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাসমূহের সমতুল্য ধ্বনির যে তালিকা প্রণয়ন করেন তাতেও তুলনামূলক ধ্বনিতত্ত্বের মূলভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

আউগুস্ট শ্লাইশার্ (August Schleicher, 1823-1868) :

তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে 'স্টাম্‌বাউম্ থিওরি' (ভাষা-বৃক্ষ তত্ত্ব)-এর প্রবক্তা ছিলেন আউগুস্ট শ্লাইশার। একটি গাছ থেকে যেমন অসংখ্য ডালপালা, শাখা-প্রশাখার সৃষ্টি হয়, তেমনি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ থেকে নানা ভাষার জন্ম হয়। তিনি ব্যাকরণের বিভিন্ন দিক অবলম্বনে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাসমূহের প্রায় পূর্ণাঙ্গ তুলনামূলক ব্যাকরণ রচনা করেন। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর গ্রন্থ—'*A Compendium of the Comparative Grammar of the Indo-European Language*'।

১৮৫৩-তে জীববিদ্যা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে শ্লাইশার তৈরি করেন তাঁর 'স্টাম্‌বাউম্ থিওরি' (ভাষা-বৃক্ষ তত্ত্ব)। শুরু হয় ডারউইন দ্বারা প্রভাবিত Evolutionary Linguistics বা বিবর্তনমূলক ভাষাবিজ্ঞানের চর্চা। শ্লাইশারের ভাষাবিজ্ঞানের প্রধান তিনটি ধারা—

১। ভাষাগুলির সম্পর্কের পারস্পরিক তত্ত্ব নির্মাণ করেন।

২। তিনি আদিভাষা বা Parent Language পুনর্নির্মাণের জন্য তুলনামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করেন।

৩। রূপতাত্ত্বিক প্রকার (Morphological Taxonomy) অনুসারে ভাষার শ্রেণি-বিন্যাস করেছেন।

কার্ল্ ব্রুগ্‌ম্যান্ (Karl Brugmann) :

জার্মানিতে উনিশ শতকের শেষপাদে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের নব্য বৈয়াকরণ গোষ্ঠীর অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন কার্ল্ ব্রুগ্‌ম্যান্। শ্লাইশারের পরে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের চরম উৎকর্ষ ঘটে তাঁর হাতে। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ—'*outline of the comparative grammar of the Indo-Germanic Language*'।

ব্রুগ্‌ম্যান্ ভাষাতত্ত্বে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ করেন। সংস্কৃত, প্রাচীন-ইরানীয়, প্রাচীন আর্মেনীয়, প্রাচীন গ্রিক, লাতিন, উম্ব্রীয়-সাম্নীতীয়, প্রাচীন আইরিশ, গথিক, প্রাচীন জার্মান, লিথুয়ানীয়, প্রাচীন বুলগেরীয় ভাষার তুলনামূলক ব্যাকরণ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রচনা করেছেন। তাঁর গ্রন্থটি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাসমূহের তুলনামূলক ব্যাকরণ রূপে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসাবে বিবেচ্য।

চুম্বক

১। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার অন্তর্গত বিভিন্ন ভাষার তুলনামূলক আলোচনা।

২। ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্বের বিভিন্ন দিকের তুলনা এসেছে।

৩। একাধিক ভাষা সম্পর্কে গভীর ব্যুৎপত্তি এবং সমগোত্রজ ভাষাগুলির উৎসভাষা বা মূল ভাষার পুনর্নির্মাণ ঘটেছে।

৪। ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব প্রথমে দার্শনিক ভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করা হলেও পরে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার হল।

৫। স্বাভাবিকভাবেই এর মধ্যে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি আছে।ভাষা আন্তর্জাতিক হল।

৬। সংস্কৃত ভাষার সমাদর বৃদ্ধি পেল।

৭। ভাষা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণাগুলির নিরসন ঘটল।

৪০৪.২.১.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব কী? তুলনামূলকতা এলো কেন? তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব চর্চার উদ্দেশ্যগুলি লেখো।

২। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সূচনা হল কীভাবে? তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের বিকাশে জার্মানি কতটা এগিয়ে?

৩। জার্মানিতে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের বিকাশে ফ্রীদ্রিশ্ ফন্ শ্লেগেল ও ক্রিস্টিয়ান রাস্কের অবদান আলোচনা করো।

৪। গ্রীমের সূত্র (Grimm's Law) কী? উদাহরণ সহযোগে সূত্রটি ব্যাখ্যা করো।

৫। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ে ফ্রীদ্রিশ্ পট্‌ের কৃতিত্ব নিরূপণ করো।

৬। জার্মানিতে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের বিস্তারে শ্লাইশার্ ও ব্রুগ্‌ম্যান্‌ের অবদান আলোচনা করো।

৪০৪.২.১.৭ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। মহাম্মদ দানীউল হক, *ভাষাবিজ্ঞানের কথা*, ২০০৭, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা।

২। রামেশ্বর শ', *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা*, ১৯৯৬, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

৩। আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, *আধুনিক ভাষাতত্ত্ব*, ২০০৭, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা।

৪। সুনন্দন কুমার সেন, *ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবিজ্ঞান*, ২০১৮, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

৫। ড. উদয়কুমার চক্রবর্তী ও নীলিমা চক্রবর্তী, *ভাষাবিজ্ঞান*, ১৪২২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

৬। শিশিরকুমার দাশ, ভাষাজিজ্ঞাসা, ১৪২৪ (ষষ্ঠ সং), প্যাপিরাস, কলকাতা।

৭। ড. নীলিমা চক্রবর্তী ও ড. উদয়কুমার চক্রবর্তী, ভাষাচর্চা ভাষাপ্রস্থান, ২০২২, শ্রীময়ী প্রকাশনী, কলকাতা।

৮। Rameswar Shaw, *Synchronic Comparative Phonology of Bengali And German*, 2001, Pustak Biponi, Kolkata.

পত্র : ডিএসই-৪০৪

বিশেষ পত্র : ভাষাতত্ত্ব

পর্যায় গ্রন্থ : ২

একক-১

ইংল্যাণ্ডের ভাষাবিজ্ঞান চর্চা

বিন্যাসক্রম :

৪০৪.২.১.১ : ভূমিকা

৪০৪.২.১.২ : উইলিয়াম জোন্‌স ও তুলনামূলক ভাষাচর্চা

৪০৪.২.১.৩ : হেনরি সুইট ও আধুনিক ধ্বনিবিজ্ঞান

৪০৪.২.১.৪ : জে. আর ফার্থ ও গঠনবাদী ভাষা বিশ্লেষণ

৪০৪.২.১.৫ : ড্যানিয়েল জোন্‌স ও ধ্বনিবিজ্ঞানের নানাসূত্র

৪০৪.২.১.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৪০৪.২.১.৭ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৪০৪.২.১.১ : ভূমিকা

খ্রিস্টের জন্মের বহু আগে থেকেই ভাষা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছিল। গ্রিস, রোম, জার্মানী, রাশিয়া, আমেরিকা, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্যের নানাদেশে ভাষার নানান দিকের প্রতিফলন লক্ষ করেছি। ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব, শব্দার্থতত্ত্ব কখনও ঐতিহাসিক, কখনও বর্ণনামূলক দৃষ্টিতে কখনও বা তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচিত হয়েছে। ইংল্যাণ্ডের ভাষাবিদ গণও ভাষাচর্চার নানান স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁদের রচিত গ্রন্থে, দৃষ্টিভঙ্গিতে। জন বীম, স্যার উইলিয়াম জোন্‌স, হেনরি সুইট, জে. আর ফার্থ, ড্যানিয়েল জোন্‌স প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানীর হাতে ইংল্যাণ্ডের ভাষাচর্চার ইতিহাস সমৃদ্ধ হয়।

৪০৪.২.১.২ : স্যার উইলিয়াম জোন্‌স (১৭৪৬-১৭৯৪)

এশিয়াটিক সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা স্যার উইলিয়াম জোন্‌স ইংরেজ ভাষাতাত্ত্বিক ও বহু ভাষাবিদ। তিনি অসংখ্য ভাষা জানতেন। তাই তাঁকে hyper polyglot বলা হতো। '*The Sanscrit Language*' (১৭৮৬) গ্রন্থে তিনি জানান, সংস্কৃত, গ্রিক ও লাতিন ভাষাগুলির উৎস এক। ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে ২ ফেব্রুয়ারি তিনি এশিয়াটিক সোসাইটিতে একটি বক্তৃতা দেন। তাতে তিনি বলেন সংস্কৃত ভাষার প্রাচীনত্ব যাই হোক, গঠনের দিক দিয়ে তা গ্রিকের চেয়ে সুসম্বন্ধ, ল্যাটিনের চেয়ে ঐশ্বর্যময় আর উভয় ভাষার চেয়ে পরিশিলীত। এই তিন ভাষার ব্যাকরণের মধ্যে আশ্চর্য ঐক্য, মনে হয় তিনটি ভাষাই জন্ম নিয়েছে একই উৎস থেকে। মনে হয় একই উৎস থেকে জন্ম হয়েছে প্রাচীন জার্মান, কেলতিক এবং প্রাচীন পারসিক। অনেকে মনে করেন এই বক্তৃতার বিষয় তুলনামূলক ভাষাচর্চার ও ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাচর্চার জন্ম দিয়েছিল। এই বক্তৃতায় জোন্‌স প্রত্ন ভাষা নিয়ে যে অনুমান করেন তার উপর ভিত্তি করে প্রত্ন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার ধারণা তৈরি হয় বলে অনেকে মনে করেন। ভাষাবংশের বৃক্ষচিত্র বা Family tree মডেল তৈরি করার দূরদৃষ্টিও তাঁর ভাবনায় পাওয়া যায়। কিছু ভুল ধারণা তাঁর মধ্যে থাকলেও সেই ধারণাকে আশ্রয় করেই পরবর্তীতে স্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠে।

৪০৪.২.১.৩ : হেনরি সুইট (১৮৪৫-১৯১২)

ইংল্যাণ্ডে ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ে প্রথম উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেন হেনরি সুইট তাঁর '*Primer of Phonetics*' (১৮৯০) গ্রন্থে। প্রত্যেক ধ্বনির জন্য স্বতন্ত্র বর্ণচিহ্ন প্রবর্তন করে ধ্বনিমূলক প্রতিলিখনের প্রথম চেষ্টা করেন। ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ক তাঁর আলোচনা ঐতিহাসিক নয়, বর্ণনামূলক। সোস্যুরের আগেই তাঁর এই প্রয়াস লক্ষ্য করি। ধ্বনিবিজ্ঞান বিষয়ক তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'Handbook of phonetics' (১৮৭৭) -এ তিনি ধ্বনিতাত্ত্বিক লিখন-পদ্ধতির নানা সমস্যার কথা উপলব্ধি করেছিলেন। ধ্বনির কোনরূপটি লিখতে হবে? ধ্বনির মূলরূপ স্বনিম নাকি তার উচ্চারণ বৈচিত্র্য উপধ্বনি? এদের মধ্যে কোনটি অনুসরণ করে ধ্বনিতাত্ত্বিক লিখন পদ্ধতি এগোবে? সুইট নিজে Phoneme ও Allophone শব্দ দু'টি ব্যবহার করেন নি। কিন্তু তিনি যে Broad ও Narrow Transcription-এর কথা বলেছেন তা মূলত আধুনিক কালের Phonemic ও Phonetic Transcription।

৪০৪.২.১.৪ : জে. আর ফার্থ (১৮৯০-১৯৬০)

ইংল্যাণ্ডের ভাষাবিজ্ঞান চর্চার একটি প্রতিষ্ঠান বলা যায় ফার্থকে। তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান'-এর অধ্যাপক পদ লাভ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে জাপানি ভাষার মিলিটারি শব্দভাণ্ডারের দ্রুত শিক্ষার পাঠক্রমের পরিকল্পনা করেন এবং যুদ্ধের পাইলটদের তার ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থা করেন। তিনি বর্ণনামূলক ও এককালীন ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বাসী ছিলেন। ম্যালিনোস্কির ভাবনাচিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ফার্থ ধ্বনিতত্ত্বের ধারণা নিয়ে ছন্দ বিশ্লেষণের দিকে গুরুত্ব দেন। ছন্দের বিশ্লেষণে স্বনিমীয় শর্তকে প্রাধান্য দেন। পরবর্তীতে তিনি Autosegmental Phonology-র তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

শব্দার্থতত্ত্বকে গুরুত্ব দিয়ে 'Meaning by Collocation' অর্থাৎ প্রাপ্ত উপাদানের বিষয়গুলি এক জায়গায়

নিয়ে এসে তার অর্থ নিরূপণের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেন। তিনি বিষয়বস্তু নির্ভর তথা Context-dependent শব্দার্থতত্ত্বকে গুরুত্ব দেন। এ বিষয়ে তাঁর বিখ্যাত উক্তি

"You shall know a word by the Company it Keeps"

(Firth; papers in Linguistics, 1957, P-11)

ছন্দ বিশ্লেষণের ধারণা ছাড়াও তিনি আরবি, সিয়ামিজ, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষার ছন্দ বিশ্লেষণের দিকে গুরুত্ব দেন। *Speech (1930) The Tongues of Men (1937) Paper in Linguistics* 1934-1951 (1957) তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ফার্থ যেভাবে তাঁর তত্ত্ব নির্মাণ করেছিলেন তা থেকেই 'Firthian' ভাষাতত্ত্ব নামে প্রচার লাভ করে। একটি System বা পদ্ধতির মধ্যে অনেকগুলি পদ্ধতিকে মিলিয়ে দেখার দিকটিকে Polysystematism বলে। ফার্থ এই Polysystematism-এর মাধ্যমে দেখার কথা বলেছিলেন। তাঁর ছাত্রদের আফ্রিকার ভাষা ও বিভিন্ন ধ্রুপদী ভাষার উপর গবেষণা করার কথা বলেন।

ফার্থের অন্যতম অবদান হল বর্ণনাপ্রাসঙ্গিক বিশ্লেষণে স্বতন্ত্র পদ্ধতি প্রয়োগ। তিনি ধ্বনিতত্ত্বীয় স্তরগুলো অর্থতত্ত্বীয় স্তররূপে মনে করেন। ধ্বনিতত্ত্বীয় আদর্শ বিশ্লেষণে তিনি সমাত্রিকরূপে চিহ্নিত করেন। তার কারণ, তিনি মনে করেন যে সমাত্রিক বিশ্লেষণে একটা প্রধান উপাদান বা বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান যা মূলধ্বনীয় ব্যাখ্যায় স্বশাসকরূপে প্রাপ্য নয়।

৪০৪.২.১.৫ : ড্যানিয়েল জোন্‌স (১৮৮১-১৯৬৭)

ইংল্যাণ্ডের ধ্বনিবিজ্ঞান ধারায় বিশেষ উন্নতি লাভ করে অধ্যাপক ড্যানিয়েল জোনসের হাত ধরে। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ—'*Outline of English Phonetics*' (1918)। ইংরেজি ভাষার ধ্বনিগুলি নিয়ে বৈজ্ঞানিক আক্ষ্ম লোচনা হলেও সাধারণ ধ্বনিবিজ্ঞানের তত্ত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তাঁর দীর্ঘ সময়ের অধ্যাপনাকালে যন্ত্রনির্ভর ধ্বনিবিজ্ঞান বিষয়ে নিত্যনতুন গবেষণা করে গেছেন। আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক সংস্থার মূল কেন্দ্র লণ্ডনে স্থানান্তরিত হবার পর আজীবন তার মধ্যমণি ছিলেন জোন্‌স। আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়েছিলেন তিনি। ধ্বনিবিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত বিবর্তিত হয়েছে।

মূলধ্বনি বা স্বনিম সম্পর্কেও তিনি আলোচনা করেছিলেন। স্বনিম সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব তত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে '*The Phoneme : Its Nature and Use*' গ্রন্থে। মূলধ্বনির ক্রিয়াগত দিক তিনি চল্লিশটা ভাষার সাহায্যে ব্যাখ্যা করেন। তিনি মূলধ্বনির সংজ্ঞা দেন

> "A phoneme is a family of sounds in a given language which are related in character and are used in such a way that no one member ever occurs in a word in the same phonetic context as any other member."

জোন্‌স প্রদত্ত এই সংজ্ঞার সঙ্গে আমেরিকান মূলধ্বনিতত্ত্ববিদদের সংজ্ঞার সঙ্গে মূলত কোন প্রভেদ না থাকলেও, মূলধ্বনি আলোচনায় তিনি আমেরিকান আদর্শ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেননি। মূলধ্বনি বিচারের আদর্শ তিনি গ্রহণ করেন লেনিনগ্র্যাড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক এল চেবরা, ক্রুজেয়িস্কি ও বদিন দ্য কতেনির কাছ থেকে। গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে তিনি মূলধ্বনি, ধ্বনিতাত্ত্বিক বর্ণমালা, মূলধ্বনি বিচারের বিভিন্ন উপাদান, ন্যূনতম

পার্থক্য, শ্রুতিগত দিক, বিশ্লেষণগত প্রক্রিয়া, ধ্বনিবিচারের মানসিক ও ক্রিয়াগত দিকের প্রয়োগ, মূলধ্বনির অর্থগত তাৎপর্য ইত্যাদি দিক সম্পর্কে উদাহরণের সাহায্যে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেন।

'The Pronunciation of English' এবং *'English Pronouncing Dictionary'* গ্রন্থ দু'টির জন্যে তিনি আন্তর্জাতিক পরিচিতি লাভ করেছেন। '*English Pronouncing Dictionary*' গ্রন্থে আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালার সাহায্যে ইংরেজি শব্দের উচ্চারণ লিপিবদ্ধ করার যে পদ্ধতি তিনি প্রবর্তন করেন, তা এখনও অনেক ভাষার অভিধানে অনুসৃত হচ্ছে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সহ ভারতের অনেক অগ্রণী ভাষাবিদ জোনসের কাছে শিক্ষালাভ করেছেন।

৪০৪.২.১.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। ইংল্যাণ্ডে ভাষাবিজ্ঞান চর্চার নানান দিকের সন্ধান দাও।

২। তোমার পাঠ্য ভাষাবিজ্ঞানীর নিরিখে ইংল্যাণ্ডের ভাষাবিজ্ঞান যে নানান শাখায় সমৃদ্ধ হয়েছে তা বিস্তার করো।

৪০৪.২.১.৭ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। মহাম্মদ দানীউল হক, *ভাষাবিজ্ঞানের কথা*, ২০০৭, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা।

২। রামেশ্বর শ', *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা*, ১৯৯৬, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

৩। আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, *আধুনিক ভাষাতত্ত্ব*, ২০০৭, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা।

৪। সুনন্দন কুমার সেন, *ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবিজ্ঞান*, ২০১৮, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

৫। ড. উদয়কুমার চক্রবর্তী ও নীলিমা চক্রবর্তী, *ভাষাবিজ্ঞান*, ১৪২২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

৬। শিশিরকুমার দাশ, ভাষাজিজ্ঞাসা, ১৪২৪ (ষষ্ঠ সং), প্যাপিরাস, কলকাতা।

৭। ড. নীলিমা চক্রবর্তী ও ড. উদয়কুমার চক্রবর্তী, ভাষাচর্চা ভাষাপ্রস্থান, ২০২২, শ্রীময়ী প্রকাশনী, কলকাতা।

পত্র : ডিএসই-৪০৪

বিশেষ পত্র : ভাষাতত্ত্ব

পর্যায় গ্রন্থ : ৩

বিশ্বভাষা, গঠনমূলক ভাষাচর্চা

একক-১

ফের্দিনা দ্য স্যোসুর

বিন্যাসক্রম :

৪০৪.৩.১.১ : ভূমিকা

৪০৪.৩.১.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৪০৪.৩.১.৩ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

৪০৪.৩.১.১ : ভূমিকা

জেনেভা প্রস্থানের পুরোধাপুরুষ ফের্দিনা দ্য স্যোসুর। ভাষাবিজ্ঞানের জগতে আধুনিকতার প্রথম সূত্রপাত করেছিলেন তিনি। তাঁরই প্রদর্শিত পথে গড়ে উঠেছিল বর্ণনামূলক (Descriptive) বা আকরণবাদী ভাষাবিজ্ঞান (Structuralist Linguistics)। জীবনের প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে তিনি জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে শুরু করলেন প্রাবেশিক বা সামান্য ভাষাবিজ্ঞান। এই সময়ে স্যোসুর তাঁর অভিনব ভাষাতাত্ত্বিক চিন্তাগুলিকে ছাত্রদের সামনে তুলে ধরেছিলেন। যা তাঁর অনুগত ছাত্রেরা বিস্তারে লিখে নিয়েছিল এবং স্যোসুরের অসুস্থতা ও মৃত্যুর পর ওঁরই দুই ছাত্র চার্লস বালি ও এলবার্ট সেশেহায়ে সম্পাদনা করে সর্বপ্রথম ফরাসি ভাষায় 'Cours de linguistique generale' (১৯১৬) নামে প্রকাশ করেন। তবে অদ্ভুত বিষয়টি হল যে গ্রন্থের জন্য স্যোসুর পৃথিবী বিখ্যাত হলেন এবং যার থেকে 'আকরণবাদ' (Structuralism)-এর গোড়াপত্তন হল সেটি উনি নিজে লিখে যেতে পারেননি।

ভাষাবিজ্ঞানীরূপে স্যোসুরের কৃতিত্বের কথা বলতে গেলেই বেশ কিছু দ্বিত্বের (Dichotomy) কথা আমাদের

মনে পড়ে যায়। যার ফলে ভাষাচিন্তা ও ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে এক আমূল পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল। ভাষার আকরণ সংক্রান্ত নীচের পাঁচটি ধারণা তাঁরই অবদান—

এক.

প্রথমটি হল এককালীন ও কালানুক্রমিক (Synchronic and Diachronic) ভাষাবিজ্ঞান। সহজ কথায়, বিশেষ একটা সময়ের ভাষাপাঠ হল এককালীন অর্থাৎ একটা কালপর্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয় এর অধ্যয়ন। এর কাজ নির্দিষ্ট কোনও কাল পরিসরে বিশেষ কোনও ভাষাগোষ্ঠী যে ভাবে কথা বলে, লেখাপড়া করে, কাজকর্ম চালায় তার তত্ত্বতালাশ করা। অন্যদিকে, বিভিন্ন কালপর্বের ভাষাপাঠ হল কালানুক্রমিক বা ঐতিহাসিক। বহমান সময়ের ভেতর বিভিন্ন কালখণ্ডে ভাষার গতিপ্রকৃতি অনুসন্ধান করা কালানুক্রমিক বা বিবর্তনমূলক ভাষাতত্ত্বের এলাকা। যেমন রুশ বা ইতালীয় ভাষা কীভাবে ল্যাটিন ভাষার মধ্যে দিয়ে বিবর্তিত হলো অথবা কীভাবে পূর্ব ভারতে প্রচলিত মাগধী প্রাকৃত থেকে কালক্রমে বাংলা ভাষার উদ্ভব হল তার খোঁজখবর নেওয়া। ভাষার ব্যাকরণ, ধ্বনিতত্ত্ব, প্রস্বরের অনুশীলন করে ভাষা প্রবাহের পাঠ প্রস্তুত করাই ঐতিহাসিক ভাষাতাত্ত্বিকের কাজ।

এককালীন ভাষাতত্ত্বের অন্বিষ্ট তন্ত্র (System) আর ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের একক (Unit) দুটোকে তিনি আলাদাই রাখতে চেয়েছেন। তাঁর বিচারে জোর পড়েছে এককালীনতার ওপর। গোটা উনিশ শতক জুড়েই সমস্ত ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণায় ছিল ঐতিহাসিক বিচারপদ্ধতির ঝোঁক। বিশেষ একটা সময়ে বিশেষ কোনও ভাষাগোষ্ঠীর পাঠ ছিল সেখানে অবহেলিত। স্যোসুর এসে এই কালানুক্রমিক আর এককালিকতার ফারাকটা স্পষ্ট করে দিলেন।

দুই.

দ্বিতীয়টি হল সামূহিক বাচন ও একক বাচন (Language and Parole)। স্যোসুর দ্বিতীয় যে বৈপরীত্যের (বাইনারি অপোজিশন) কথা বলেছেন সেটি হল লাঙ্ ও পারোল। লাঙ্ হল সামাজিক মানুষের সমষ্টিগত নির্মাণ। আসলে এটি নির্দিষ্ট কোনও ভাষাগোষ্ঠীর আয়ত্তে থাকা একটি আলমারি। যেন একটি স্থায়ী ভাষা ভাণ্ডার। যার মধ্যে সেই নির্দিষ্ট ভাষার সকল সম্ভাব্য চিহ্নকে রাখা রয়েছে। লাঙ্ একটি বিমূর্ত ব্যাপার। অন্যদিকে আমি যা বলছি বা লিখছি তাকেই স্যোসুর বললেন পারোল। সুতরাং লাঙ্ ভাষার সামাজিক রূপ, পারোলের মধ্যে তার ব্যবহারিক বৈচিত্র।

তিন.

তৃতীয়টি হল অভিব্যক্তি ও আধেয় (Expression and Content)। ভাষার সংস্থান বা কাঠামোটি এখানে বেশ জটিল। ধ্বনি আর অর্থ তার দুই স্তম্ভ। স্যোসুর এদের বলেছেন অভিব্যক্তি আর আধেয়। অভিব্যক্তি বা আধেয় পৃথকভাবে নয় বরং উভয়ের সমন্বয়েই গড়ে ওঠে ভাষার কাঠামো বা আকরণ। ধ্বনি, শব্দ, পদবন্ধ বা বাক্য এদের যেভাবে আমরা বলি, শুনি, অনুভব করি বা বিশেষ কোনও অর্থের সাহায্য ছাড়া কল্পনা করি তারই এক তন্ত্রকে বলি অভিব্যক্তি। কথ্য ভাষার মধ্যেই সবচেয়ে পরিপূর্ণভাবে লক্ষ করা যায় এই অভিব্যক্তি। একটা গোটা অভিব্যক্তির সবচেয়ে ছোট একক হল বাক্য। ভাষার তন্ত্র অনুযায়ী বাক্য কখনও একটা উচ্চারণেই শেষ হতে পারে না, কখনও বা তা গড়াতে পারে একাধিকে। বাক্য তৈরি হয় শব্দ, পদবন্ধ বা বাক্যাংশ দিয়ে। শব্দের থাকে অর্থ। কোনও বস্তু বা তার গুণ অথবা কোনও প্রক্রিয়াকে দ্যোতিত করে সেই অর্থ। শব্দ তার আকরণিক ভূমিকার (structural function) সাহায্যে অন্যান্য শব্দের সহযোগে গড়ে তোলে অর্থবোধক বাক্য।

চার.

চতুর্থটি হল পদার্থ ও রূপ (Substance and Form)। স্যোসুরের চতুর্থ প্রত্যয় হল পদার্থ এবং রূপ। মুদ্রার যেমন দুটি দিক তেমনি আমাদের ভাষা প্রতীকগুলিরও দুটি দিক রয়েছে। সোসুরীয় পরিভাষায় তাদের বলা হয় চিহ্নক বা signifier ও চিহ্নিত বা signified। ধরা যাক, একজন মৃৎশিল্পী মাটি দিয়ে মূর্তি গড়তে চান। অর্থাৎ তিনি মাটি নামক কিছু কাঁচামালের সাহায্যে একটা মূর্তি নামক বস্তুর আদল দিতে চাইছেন। কিংবা কথাটাকে অন্যভাবেও বলা যায়, পদার্থ থেকে রূপ-এ পৌঁছতে চাইছে। তাহলে এখানে মাটি হল পদার্থ আর মূর্তি হল রূপ। ভাষার ক্ষেত্রেও তেমনি রয়েছে পদার্থ আর রূপ।

মানুষের স্বরযন্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনি নির্গত হয়। মানুষের হাত থেকে নিঃসৃত হয় নানারকম লিপি। এই ধ্বনি বা লিপি হল ভাষার পদার্থ। ধ্বনিকে বলা যেতে পারে ধ্বনিগত পদার্থ আর লিপিকে দৃশ্যগত। এইসব কাঁচামাল বা পদার্থের সাহায্যেই গড়ে ওঠে ভাষার ইমারত। পদার্থ আর রূপকে আমরা দুটো স্তরে বিশ্লেষণ করতে পারি, যথা—আধেয় তল আর অভিব্যক্তি তল। অভিব্যক্ত তলে ভাষাতাত্ত্বিকেরা ভাষার উপাদানগুলির চেহারা বা আক্ষ্ম দলটাকে বিচার করেন। অন্যদিকে আধেয় তলে বিচার্য হল তার অর্থ। অভিব্যক্ত তলের মীমাংসা আধেয় তলের থেকে অপেক্ষাকৃত সরল। আর সে কারণেই আধেয় তলের আগে বিশ্লেষণ করা হয় অভিব্যক্ত তলের।

পাঁচ.

পঞ্চমটি হল ক্রমান্বয় ও বৈকল্পিক (syntagmatic and paradigmatic)। স্যোসুর আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বিভাজন বা binary opposition-এর কথা উল্লেখ করেছিলেন। দ্বিত্ব দুটি হল যথাক্রমে—syntagmatic relations বা ক্রমান্বয়িক সম্পর্ক এবং paradigmatic বা বৈকল্পিক সম্পর্ক। যখন আমরা কোনও একটি শব্দচিহ্নকে বাক্যের মধ্যে প্রযুক্ত করি তখন আমরা একাধিক চিহ্ন ব্যবহারের সম্ভাবনা থেকে সেই নির্দিষ্ট একটিমাত্র চিহ্নকেই নির্বাচন করে থাকি। এই paradigmatic relation-এর ক্ষেত্রে চিহ্নের নির্বাচন প্রক্রিয়াটি যথাক্রমে—

এই ^{১} অথবা এই ^{২} অথবা এই ^{৩} অথবা...

এই ^{২} এবং এই ^{৩} যদি আমরা নির্বাচন না করে থাকি তাহলে এই ^{১} এর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক হল অনুপস্থিতির সম্পর্ক। কেননা, তাদের বিকল্পরূপে এই ^{১} এখানে প্রযুক্ত হচ্ছে। অপর প্রান্তে, syntagmatic বা ক্রমান্বয়িক সম্পর্কটি তৈরি হয় চিহ্নগুলির রৈখিক বিন্যাসের মধ্য দিয়ে। এক্ষেত্রে চিহ্নের নির্বাচনটি হবে—

এই ^{১} এবং এই ^{২} এবং এই ^{৩} এবং...

এটি আসলে চিহ্ন সমন্বয়ের একটি প্রক্রিয়া। paradigmatic এবং syntagmatic সম্পর্কটির অবস্থান যথাক্রমে অনুশীর্ষক (vertical) ও অনুভূমিক (horizontal)। নীচে বিষয়টিকে তুলে ধরা হল—

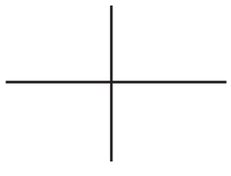

এই ১ এবং এই ২ এবং এই ৩ এবং...

এই ১ অথবা এই ২ অথবা এই ৩ অথবা...

ফের্দিনা দ্য স্যোসুর বলেছিলেন যে, একটা ভাবী বিজ্ঞানের কথা যার জন্ম অবশ্যম্ভাবী ও আবশ্যিক এবং ভাষাবিজ্ঞান হবে এই বিশাল বিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গমাত্র। যার পূর্ণতর রূপের নামকরণ করলেন 'চিহ্নবিজ্ঞান' বা 'Semiology' নামে। চিহ্নবিজ্ঞান বলতে আমরা সাধারণভাবে বুঝি চিহ্নের অধ্যয়নকে অর্থাৎ 'The study of sign'. 'চিহ্ন' বা 'Sign' শব্দটি এসেছে ফরাসি ভাষা থেকে। এটি ফরাসি 'Signe' শব্দ থেকে 'Signum' (ল্যাটিন) শব্দের মধ্য দিয়ে ইংরাজিতে এসেছে। যার অর্থ মার্ক (Mark), টোকেন (Token) বা চিহ্ন। এর পরেই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, চিহ্ন (Sign) কী? এক কথায় চিহ্ন হল কোনও কিছুর ওপরে সাংকেতিক মূল্য আরোপ করা।

স্যোসুর বলেছিলেন যে, ভাষা আসলে একটা চিহ্নতন্ত্র (sign system)। আর যে কোনও ভাষাই তৈরি হয় শব্দ দিয়ে। অর্থাৎ তিনি শব্দকেই ভাষিক চিহ্ন (linguistic sign) রূপে দেখেছিলেন। একটি মুদ্রার দুটি পিঠের মতোই যে কোনও চিহ্নের দুটি দিক রয়েছে। একটি signifier বা চিহ্নক। যাকে চিহ্নায়কও বলা যেতে পারে। অপরটি হল signified বা চিহ্নিত অথবা চিহ্নায়িত। ধ্বনির যোগফল হল চিহ্নক। চিহ্নিত হল একটি ধারণার মানসিক প্রতিরূপ। একটি উদাহরণ দিয়ে বলা যায় গোরু চিহ্নটির চিহ্নক হল গ/ও/র/উ। অর্থাৎ ধ্বনির মিলিত রূপই কোনও চিহ্নের চিহ্নক। আর আমাদের মনে গোরুর যে ধারণাগত রূপ বা mental image রয়েছে তাই হল চিহ্নিত।

আমাদের মনোলোকে বস্তু বা প্রাণিজগতের ধারণা রয়েছে বলেই আমরা শব্দ থেকে অর্থে পৌঁছতে পারি। চিহ্নক হল পদার্থিক। অন্যদিকে চিহ্নিতের ব্যাপারটি মনস্তাত্ত্বিক। যেহেতু একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির কথা আলোচনা করা যায় না তাই চিহ্নক ও চিহ্নিতের ঐক্যকে স্যোসুর বললেন চিহ্ন। আদিকাল থেকেই চিহ্নের দুটি বৈশিষ্ট্য বর্তমান। এক যথেচ্ছতা বা স্বেচ্ছাচারিতা। স্যোসুরের ভাষায় যা arbitrariness। দুই অনাক্রম্যতা বা immunity। যেমন, কুকুর ধারণাটির জন্যে ভিন্ন ভাষায় ভিন্ন রকমের চিহ্নক বা signifier আছে। বাংলায় 'কুকুর', সংস্কৃতে 'শ্বন', ইংরাজিতে 'ডগ', হিন্দিতে 'কুত্তা' ইত্যাদি। এটাই হল চিহ্নের যথেচ্ছতা বা arbitrariness। যে কোনও চিহ্নকের উৎপত্তির মূলে থাকে সেই ভাষাগোষ্ঠীর প্রথা বা লোকাচার। ব্যক্তিবিশেষ হঠাৎ করে তাকে বদলে ফেলতে পারে না। এটিই হল চিহ্নের immunity বা অনাক্রম্যতা। স্যোসুর তাই চিহ্নের দুটি প্রাথমিক বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছিলেন—

'Principle I : The Arbitrary Nature of the Sign'

এবং

'Principle II : The Linear Nature of the Signifier'

প্রথম বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। চিহ্নের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি হল চিহ্নকের 'linear nature'। চিহ্নকের ক্ষেত্রে শ্রবণ ক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। শোনার ক্ষেত্রে একই মুহূর্তে কখনওই একাধিক চিহ্নক উৎপাদিত হয় না। আত্মকথন বা monologue-এর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কারণ একটি মুহূর্তে আমরা একটি শব্দই ভাবতে পারি। আর এখানেই দৃশ্যকেন্দ্রিক চিহ্নকের সঙ্গে শ্রবণকেন্দ্রিক চিহ্নকের পার্থক্য। দৃশ্যের ক্ষেত্রে এক মুহূর্তেই একাধিক চিহ্ন প্রকাশিত হতে পারে। যে কোনও রকমের সাহিত্যকৃতির ভাষিক চিহ্নের অবস্থান linear বা রৈখিক সম্পর্কে আবদ্ধ। যাকে আমরা সিনট্যাগম বলতে পারি।

এককভাবে কোনও চিহ্নেরই মূল্য নেই। একটি চিহ্ন তখনই মূল্য পায় যখন অপর একটি চিহ্নের পাশে এসে অর্থপূর্ণ স্বাতন্ত্র্য অর্জনে সমর্থ হয়। একটি চিহ্নের সঙ্গে অন্য একটি চিহ্নের পার্থক্য আছে বলেই দুটি চিহ্ন অর্থবহ। মন্দিরের স্থাপত্যের সঙ্গে মসজিদের স্থাপত্যের পার্থক্য আছে বলেই মন্দির এবং মসজিদ দুটিই অর্থবহ। তাই তিনি বলেছেন যে, শব্দের আসলে নিজস্ব কোনও অর্থ নেই, মানুষ শব্দে অর্থ আরোপ করে বলেই শব্দের অর্থ সৃষ্টি হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, 'পদ্ম' একটি ফুলের নাম আবার 'গোলাপ' আর একটি ফুল, কিন্তু পদ্মের মধ্যে যেমন বিশেষ কোনও 'পদ্ম'-ত্ব নেই, ঠিক তেমনি গোলাপের মধ্যে নেই বিশেষ কোনও 'গোলাপ'-ত্ব। আজ থেকে যদি বাংলা ভাষা-গোষ্ঠীর সকলে ঠিক করেন যে, 'পদ্ম'-কে 'গোলাপ' বলে ডাকবেন আর 'গোলাপ'-কে 'পদ্ম', তাতে কোনও কিছুরই বিন্দুমাত্র তারতম্য ঘটবে না, শুধু বদলে যাবে চিহ্নগুলি। এ যেন শেকসপিয়রের সেই অমোঘ সংলাপ—

"Whats in a name? That which we call a rose by any other name would smell as sweet."

ছয়.

শেকসপিয়র যা কাব্য করে বলেছিলেন তাকেই স্যোসুর তত্ত্বের ভাষ্যে প্রতিষ্ঠিত করলেন। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে, ভাষা কিন্তু কোনও নামকরণের পদ্ধতি নয়। একটি বস্তুকে আমরা যে নামে চিনি, সেই বস্তু এবং নামের মিলিত রূপ কিন্তু চিহ্ন নয়। চিহ্ন আসলে ধ্বনি-চিত্র (sound image) এবং বোধের (concept) মিলিত সমষ্টি। আবার ধ্বনি-চিত্র মানেই যে কেবল ধ্বনির দ্বারা সৃষ্ট আওয়াজ বা sound তা নয়। ধ্বনি-চিত্র বলতে 'psychological imprint of the sound-কেও বোঝানো হয়। আত্মকথনের সময়ে ধ্বনির কোনও আওয়াজ না থাকলেও ধ্বনি-চিত্র থাকে। আবার এখানে কোনও রকমের ধ্বনি উৎপাদিত হয় না ঠিকই, কিন্তু ধ্বনির বোধ সবসময়ই উপস্থিত থাকে।

ফার্দিনান্দ দ্য স্যোসুরের চিন্তন বিংশ শতকের ভাষাবিজ্ঞানের নক্‌শাকেই যে শুধু বদলে দিল তা নয় সমস্ত মানবীকি বিদ্যাতে, সাহিত্যে ও সমাজ-বিষয়ক সবকটি ক্ষেত্রেই একটা বড়ো রকমের পরিবর্তন এল। জন্ম নিল একটা নতুন আলোড়ন, নব আন্দোলন যাকে আমরা 'আকরণবাদ' (Structuralism) নামে জানি।

৪০৪.৩.১.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১) ফার্দিনান্দ দ্য স্যোসুরের ভাষাচিন্তার পরিচয় দাও।

২) চিহ্নবিজ্ঞান বা সেমিওলজি কাকে বলে? বিষয়টি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

৩) ফার্দিনান্দ দ্য স্যোসুরের চিহ্ন সম্পর্কিত ভাবনাটি নিজের ভাষায় উদাহরণসহ আলোচনা করো।

৪০৪.৩.১.৩ : সহায়ক গ্রন্থ ও পত্রিকাপঞ্জি

১) Ferdinand De Saussure– 'Course In General Linguistics'– 1959 ed. Charles Bally and Albert Sechehaye– trans. Wade Baskin– New York Philosophical Library

২) Daniel Chandler– 'Semiotics The Basics' – 2002– London & New York Routledge

৩) রামেশ্বর শ', 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা', ১৪১৯, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

৪) ড. সুখেন বিশ্বাস, 'ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ', ২০১১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৫) আলোচনা চক্র, মনন বিশ্ব পরিচয়, ২০১৭

৬) এবং জলার্ক, ধ্বংস ও নির্মাণ সংখ্যা, ২০০৭

পত্র : ডিএসই-৪০৪

পর্যায় গ্রন্থ : ৩

বিশ্বভাষা, গঠনমূলক ভাষাচর্চা

একক-২

ভাষা পরিকল্পনা

বিন্যাসক্রম :

৪০৪.৩.২.১ : ভূমিকা

৪০৪.৩.২.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৪০৪.৩.২.৩ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৪০৪.৩.১.১ : ভূমিকা

পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের বড় সমস্যা হল ভাষা। কারণ সকল দেশ বা প্রদেশই নিজেদের ভাষাকে গুরুত্ব দিতে বদ্ধপরিকর। উদার, মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে অন্যের ভাষাকে গ্রহণ করতে কম মানুষই পারে। তাই দেশে দেশে, প্রদেশে প্রদেশে ভাষা পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা দেখা গেছে। এর জন্যে বিভিন্ন সংস্থাও সারা পৃথিবীতে কাজ করে চলেছে। 'ভাষা পরিকল্পনা' শব্দটি ভাষা পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত। কারণ ভাষার কোনও কিছুকে পালটানোর প্রয়োজন হলে দরকার হয় পরিকল্পনার। ভাষাকে সুষ্ঠু রূপ দেওয়ার জন্যে সংস্কার করা প্রয়োজন।

ভাষাবিজ্ঞানীরা কালে কালে তাই ভাষায় ব্যবহৃত বানান, সূত্র, রীতি-পদ্ধতি ইত্যাদির সংস্কার করে চলেছেন। পৃথিবীতে ভাষা সংস্কারের কাজ প্রথম করেছেন মহামনীষী পাণিনি। 'অষ্টাধ্যায়ী' ব্যাকরণে তিনি যেভাবে বৈদিক ভাষার লেখ্য রূপের সংস্কার করেছেন তা থেকে আজও ভাষা সংস্কারের ধারা অব্যাহত। এর জন্যে দেশবিদেশে ভাষা পরিকল্পনা সম্পর্কীয় সংস্থা গড়ে উঠেছে। ভাষা পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মনীষীরা বিভিন্ন সময়ে ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

যাই হোক, ভাষা পরিকল্পনা বা Language Planing শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন ইউরিয়েল ভায়েনরাইক। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৫৭ সালে দেওয়া এক বক্তৃতায়। অতঃপর এর এক বছর পরে ১৯৫৮ সালে আমেরিকান এনথ্রোপলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের এক সভায় হাউজেন একই শব্দ ব্যবহার করেন। ধীরে ধীরে শব্দটি স্থায়ী রূপ পায়। পরে অবশ্য টৌলি, হাউজেন প্রমুখর প্রচেষ্টায় ভাষা পরিকল্পনার ব্যাপারটি ভাষাতত্ত্বচর্চার অন্যতম অঙ্গ হয়ে ওঠে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে ১৯৫৭ সাল দুটি কারণে বিখ্যাত। প্রথমত চমস্কি তাঁর 'Syntactic Structures' গ্রন্থে প্রথম বীজবাক্যের ধারণা দিয়েছিলেন। আর ইউরিয়েল ভায়েনরাইক 'Language Planing' (ভাষা পরিকল্পনা)-এর কথা বললেন। দেশ-বিদেশের দার্শনিকরা ভাষা পরিকল্পনা সম্পর্কে যে মতামত দিয়েছেন তার ভিত্তিতে একটা সর্বজনীন সংজ্ঞা নির্ণয় করা যেতে পারে"কোনও ভাষাকে নিয়ন্ত্রণ করা সংস্কার বা উন্নত করা কিংবা ভাষার ব্যবহার সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান করার জন্যে অনুশাসন বা বিধানমূলক নতুন একটি আঞ্চলিক ভাষা, জাতীয় ভাষা বা আন্তর্জাতিক ভাষা তৈরি করার সচেতন কার্যকলাপই হল ভাষা পরিকল্পনা।"

এক.

আমেরিকান ভাষাবিজ্ঞানী এডওয়ার্ড স্যাপির একটি সুন্দর কথা বলেছেন, 'Language is in a state of continuous flux'. ভাষার পরিবর্তনশীলতার বিষয়টি এই বাক্য থেকে সহজেই বোঝা যায়। কেউ কেউ এই পরিবর্তনের পিছনে সামাজিক কারণ খুঁজে পেয়েছেন, কেউ বা তত্ত্বগত কারণের কথা বলেছেন। এটি অবলীলায় চলে। এর জন্যে কোনও চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। কারণ পরিবর্তনশীলতাই ভাষার ধর্ম। কিন্তু যখন কোনও মানুষ, প্রতিষ্ঠান বা সরকারি উদ্যোগে ভাষার পরিবর্তন সাধন করা হয়, তখনই সেটা ভাষা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। রুবিন ও এনুড চমৎকার বলেছেন, 'Language planing is deliberate language change' অর্থাৎ ভাষা পরিকল্পনা আসলে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে ভাষার পরিবর্তন সাধনের প্রচেষ্টা। মানুষ, প্রতিষ্ঠান বা সরকার নিজেদের প্রয়োজনেই ভাষার পরিবর্তন করেছে। এখনও করে চলেছে। মূলত বাস্তব ও তাত্ত্বিক পটভূমিতে ভাষার পরিকল্পনা করা হয়ে থাকে।

বিষয়টি অনুধাবন করলে সহজেই বোঝা যায় একসময় আমাদের দেশসহ পৃথিবীর বহু দেশ পরাধীন ছিল। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা দেশের মানুষের স্বাধীনতা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, ভাষা সমস্ত কিছুকেই গ্রাস করেছিল। সেই সময় বিদেশি ভাষা দেশীয় ভাষার উপর প্রভাব ফেলে দেশীয় ভাষাকে বিপর্যস্ত করেছিল। অতঃপর দেশ স্বাধীন হল। দেশের মানুষজন তাদের হৃতগৌরব ফেরত পেতে চেষ্টা করল। বিশেষ করে চেষ্টা করল ঔপনিবেশিক ভাষার পরিবর্তে দেশি বা মাতৃভাষাকেই প্রতিষ্ঠা দিতে। এ ছাড়াও সরকারি অফিস, আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রচার মাধ্যম ইত্যাদিতে যে ঔপনিবেশিক ভাষা-সংস্কৃতি স্থান দখল করেছিল সেখানেও দেশীয় ভাষার প্রয়োজনীয়তা বোঝা গেল। আর তখনই দেখা গেল ভাষাগত সংকট ও হাজারো সমস্যা। এগুলি এতটাই জটিল, এতটাই সমস্যাবহুল যার জন্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক সম্মেলন শুরু হয়েছে। ভারত, পাকিস্তান বা বাংলাদেশের কথা যদি ধরা যায় তবে দেখা যাবে স্বাধীনতার পর এখানকার মানুষরা যথাক্রমে হিন্দি, উর্দু ও বাংলা ভাষাকে জাতীয় ভাষা করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিল। এ ছাড়া প্রত্যেকটি দেশের রাজ্যগুলিতে প্রাদেশিক ভাষা হিসাবে নিজেদের

ভাষাকে প্রথম ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেবার চেষ্টা তো আছেই। অনেক সময় দেখা গেছে প্রথম ভাষার সমস্যা মিটলেও দ্বিতীয় ভাষার সমস্যা দেশ বা জাতিকে পরুদস্ত করেছে।

যুগে-যুগে, কালে-কালে, দেশে-দেশে ভাষা পরিবর্তনশীল। এ কথা আমাদের সকলেরই জানা। লক্ষ করলে দেখা যাবে কখনও ধ্বনি, কখনও শব্দ, কখনও অর্থের পরিবর্তনে ভাষার পরিবর্তন হয়েছে। এর জন্যে ভাষাবিজ্ঞানে অনেক তত্ত্ব বা সূত্রও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেইসব তত্ত্ব বা সূত্রের মাধ্যমে সহজেই ধ্বনি, শব্দ বা শব্দের অর্থ পরিবর্তনের স্বরূপ চিহ্নিত করা যায়। অনেক সময় আবার ভাষার পরিবর্তনকে কোনও সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। ব্যতিক্রমী নিয়মনীতি হিসাবে সেগুলি আলাদা মর্য্যাদা পেয়ে থাকে।

তা ছাড়া সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানে ভাষার গঠনগত দিক বিশ্লেষণ করা হলেও কালে-কালে, যুগে-যুগে ধ্বনি, শব্দ, অর্থের পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করা হয় না। তাহলে বোঝা যাচ্ছে ভাষার পরিবর্তন ও সাংগঠনিক তত্ত্ব পরস্পরের বিপরীতমুখী। পরস্পরের বিরোধী। এই রকম সময়ে মানুষ সচেতনভাবে ভাষার পরিবর্তন করতে চাইলে তখন তো বলতেই হবে এটি একটি তাত্ত্বিক সংকট। অর্থাৎ এক ভাষা তাড়িয়ে অন্য ভাষার স্থান দেওয়া, পুরনো শব্দকে ঝেড়ে ফেলে নিত্য-নতুন শব্দের প্রতিষ্ঠা, শব্দের পুরনো অর্থকে বাদ দিয়ে নতুনতর অর্থে তাকে প্রযুক্ত করা সবই তো তাত্ত্বিক সংকট। এখানে একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে স্বাভাবিকভাবে যদি কোনও ভাষার পরিবর্তন হয়ে যায় তখন সেটা নিয়ে মানুষ বেশি হইচই করে না। কিন্তু সচেতনভাবে মানুষ যখন কোনও ধ্বনি, শব্দ বা অর্থের পরিবর্তন সাধন করে তখনই সেটা নতুন রীতি স্থাপনের প্রচেষ্টা হতে পারে, আবার ভাষাকে সংযমী, মান উন্নয়ন ইত্যাদি করার প্রসঙ্গও হতে পারে।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, বিশেষ করে নরওয়েজিয়ান, তুর্কি, হিব্রু, সোয়াহিলি ইত্যাদি ভাষার কখনও পরিবর্তন করা হয়েছে, কখনও বা প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এখানে মানুষের চেতনা, জ্ঞান, বুদ্ধি, অনুভূতি কাজ করেছে। ভাষা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এই যে সচেতন পরিবর্তন, এটাই তাত্ত্বিক পটভূমি হিসাবে পরিচিত। নিশ্চিতরূপে এটি সর্বজনীন ভাষা প্রবণতা। এই তাত্ত্বিক প্রবণতা দেশে-বিদেশে ক্রমশই বেড়ে চলেছে। ফলে ভাষা পরিকল্পনার ক্ষেত্রও প্রসারিত হয়েছে।

দুই.

দেশ বিদেশে যেভাবে 'Language Planing' বা ভাষা পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়েছে, তাতে মূলত দু"ধরনের উদ্দেশ্য লক্ষ করা যাচ্ছে। সেগুলি হল ভাষার অবস্থান পরিকল্পনা ও গঠনগত পরিকল্পনা। এই দুই উদ্দেশ্যের নিরিখে ভাষার অবস্থান নির্ধারণ ও বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে চলেছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান।

ভাষা পরিকল্পনার আরেক নাম 'ভাষাপ্রযুক্তি'। Springer– Sibayan প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানী ভাষাপ্রযুক্তি অর্থে ভাষা-পরিকল্পনাকে বোঝাতে চেয়েছেন। কারণ ভাষা পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণ করতে সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত দিক ব্যবহার করা হয়। যেমন- বেতার, দূরদর্শন, সংবাদপত্র ইত্যাদি। তবে এর সাধারণ উদ্দেশ্য এইরকম

১) পৃথিবীর প্রত্যেকটি ভাষাই বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। বানানগত, উচ্চারণগত, অর্থগত সব ক্ষেত্রেই এই সমস্যা লক্ষণীয়। ভাষা পরিকল্পনার মাধ্যমে ওইসব সমস্যার যথার্থভাবে বিশ্লেষণ করে সমাধান করা হয়।

২) প্রথম ভাষা, দ্বিতীয় ভাষা, সংবিধান স্বীকৃত ভাষা ইত্যাদি নির্ধারণের জন্যে সব দেশ বা রাজ্যে কমবেশি সমস্যা আছে। সেটি ভাষা ব্যবহারের অনুপাত অনুযায়ী প্রথম, দ্বিতীয় ভাষা নির্ধারণ করাও এই পর্বের উল্লেখযোগ্য কাজ।

৩) ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য বা প্রদেশ বিভাজনও ভাষা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত।

৪) প্রত্যেক ভাষারই একাধিক উপভাষা আছে। ফলে একটি ভাষার বিভিন্ন উপভাষাতে মানুষ তাদের ভাব বিনিময় করে। কিন্তু সমস্যা হয় সেই উপভাষার কোনটিকে আদর্শ ধরা হবে। যেমন বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে পাঁচটি উপভাষা। অর্থাৎ রাঢ়ী, বঙ্গালী, ঝাড়খণ্ডী, বরেন্দ্রী, কামরূপী। এ ক্ষেত্রে রাঢ়ী উপভাষাকে কেন্দ্র করেই আদর্শ চলিত বাংলার (Standard Colloquial Bengali) রূপ গঠিত হয়েছে। সব ভাষারই আদর্শরূপ নির্ণয় করা ভাষা পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত।

৫) ভাষা পরিকল্পনার সাহায্যে ভাষার অবস্থানকে বদলানো হয়। অর্থাৎ আগে সামাজিক অবস্থান থেকে উন্নততর অবস্থানে রূপান্তর করা হয়।

৬) ভাষা পরিকল্পকদের কাজ বিভিন্ন তত্ত্ব বা সূত্র প্রতিষ্ঠা করা। সেটি অবশ্যই নির্ধারিত বিষয়কেন্দ্রিক হওয়া উচিত। নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে তত্ত্ব বা সূত্র প্রতিষ্ঠা করলে সেই সূত্র যে কোনও ভাষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব।

৭) যে সব ভাষার মৌখিক রূপ আছে সেই সব ভাষার লিখিত রূপ দেওয়া বা মৃত ভাষাকে পুনর্জীবিত করাও ভাষা পরিকল্পনার মধ্যে পড়ে। মূলত লিপি পদ্ধতির প্রবর্তন, সম্প্রসারণ সবই এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত।

৮) ভাষা পরিকল্পনার কাজটি করা উচিত মূলত সরকার নির্ধারিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। এ ছাড়া বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা একাধিক ভাষাবিজ্ঞানীর মাধ্যমেও করা যেতে পারে। কারণ সরকারি উদ্যোগ না নিলে ভাষা সংস্কারের কাজটা খুবই কঠিন হয়ে যায়।

৯) ভাষা পরিকল্পনার মাধ্যমে কোনও ভাষার একটা লিখিত আদর্শ তো গড়ে তোলা হবেই, তা ছাড়া সেই ভাষার একটি মৌখিক আদর্শও থাকবে। মৌখিক আদর্শ বরাবরই লিখিত আদর্শকে অনুসরণ করবে তবেই ভাষা পরিকল্পনার কাজটা সামাজিক মর্য্যাদায় রূপান্তরিত হবে।

১০) ভাষা পরিকল্পনার জন্যে থাকবে ভাষানীতি। এখানে মূলত ভাষার তত্ত্বগত দিকই গুরুত্ব পাবে। ভাষানীতি না নিয়ে ভাষা পরিকল্পনার কাজ করলে সেটি যথার্থ রূপ পাবে না।

১১) ভাষা যেহেতু পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত, তাই যে কোনও দেশের যে কোনও ভাষার ক্ষেত্রেই ভাষা পরিকল্পনার বিষয়টি আবশ্যিক। এবং এই পরিকল্পনা খুবই সচেতন ভাবে করতে হয়। মাতৃভাষা যেহেতু যে কোনও মানুষের ক্ষেত্রেই 'Sensitive' তাই তার সংস্কার করতে যাওয়া মানুষের অনুভূতিতে আঘাত হানতে পারে। অতএব খুবই সূক্ষ্ম অথচ সুচিন্তিতরূপে ভাষা পরিকল্পনা করা উচিত।

তিন.

ভাষা পরিকল্পনার সঙ্গে প্রথম থেকেই অনেক ভাষাবিজ্ঞানীর নাম জড়িয়ে আছে। তাঁরা ইউরিয়েল ভায়েনরাইক, হাউগেন, টোলি, পুণ্যশ্লোক রায়, ওয়াইনস্টাইন প্রমুখ। পরের দিকে অবশ্য ক্লস, নেউস্তুপনি, এনুড, নস প্রমুখর নাম বিশেষভাবে এই কাজে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ভাষাবিজ্ঞানীরা ভাষার পরিকল্পনা রূপায়ণে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। এই সমস্যাকে অধ্যাপক মৃণাল নাথ দু'ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন

ক. ভাষার আন্তর সংগঠনের সমস্যা।

খ. ভাষার জাতীয় বা অন্যান্য সমস্যা।

ভাষার আন্তর সংগঠনের সমস্যাকে ভাষাবিজ্ঞানীরা এইভাবে দেখেছেন। ক্লসের মতে এটি ভাষার অঙ্গ পরিকল্পনার মধ্যে পড়ে। নেউস্তুপনি ভাষার পরিশীলন, এনুড-ভাষার উন্নয়ন ও হাউজেন কোডায়নের কথা বলেছেন। অন্যদিকে জাতীয় ও অন্যান্য সমস্যার কথা বলতে গিয়ে ক্লস তো ভাষার মর্য্যাদা পরিকল্পনার উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। নেউস্তুপনি নীতির কথা, এনুড ভাষা নির্ধারণ, হাউজেন ভাষা নির্বাচন ও নস ভাষানীতির উপরই গুরুত্ব দিয়েছেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার মতো বাংলা ভাষার মান উন্নয়নের জন্যেও বিভিন্ন সময়ে পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই মহৎ কাজে বিভিন্ন সময়ে বাঙালি দার্শনিকদের যোগ লক্ষণীয়। কিন্তু প্রথম যিনি এই কাজে এগিয়ে এসেছিলেন তিনি তো একজন বিদেশি। নাম জন বিমস। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ এমনিতেই বাংলা সাহিত্যে বিখ্যাত। কারণ ওই সময় বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার শুভ সূচনা হয়েছিল। 'বঙ্গদর্শন'-এর সূচনা মানেই নতুন ভাবে বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির জাগরণ। যাই হোক এই সময়ই বাংলা সাহিত্যের উন্নয়নের জন্যে জন বিমস একটি অকাদেমি গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সেটি অবশ্য কার্যকর হয়েছিল একুশ বছর পর। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে, প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'The Bengali Academy of Literature' পরবর্তীকালে এটিই 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' নামে পরিচিত হয়েছে। এরই কিছু পরে অবশ্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অকাদেমি বাংলা ভাষা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে পদক্ষেপ নিয়েছে। এ ছাড়া ব্যক্তিগত উদ্যোগে, বিচ্ছিন্নভাবেও অনেক দার্শনিক বাংলা ভাষার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। যেমন শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, প্রমথ চৌধুরী, গোপাল হালদার প্রমুখ। তাঁদের ভাবনাকে গৌণ ও মুখ্য ভাবে বিন্যস্ত করে বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে।

গৌণ পরিকল্পনা এই পর্যায়ে নিরক্ষরতা দূরীকরণ ভাষা পরিকল্পনার প্রধান কাজ। তা ছাড়াও বাংলা ভাষাকে উন্নয়নের লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মিলিত প্রচেষ্টার কথাও এখানে বলা হয়েছে। ভাষার উন্নয়নের লক্ষ্যে সমস্ত সমস্যা পর্যবেক্ষণ করে একটা নীতি নেওয়া উচিত। পাশাপাশি কীভাবে বাংলা ভাষার সংস্কার করা হবে সে সম্পর্কেও ভাবা উচিত।

মুখ্য পরিকল্পনা বাংলা ভাষার মান্যরূপ দেওয়ার জন্যে গৌণ পরিকল্পনার পাশাপাশি মুখ্য পরিকল্পনার বিভিন্ন ধারাও লক্ষণীয়। সেগুলি মূলত লিপি পদ্ধতির উন্নয়ন, বানানবিধি নির্মাণ, পরিভাষা সৃজন, অভিধান প্রণয়ন, ভাষারূপ তৈরি ও আদর্শ শিশুপাঠ্য রচনা। এবারে সেগুলি বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। বাংলা লিপি উদ্ভাবনের

ক্ষেত্রে পঞ্চানন কর্মকার ও মনোহর কর্মকারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের তৈরি লিপি পদ্ধতি বিভিন্ন সংস্কারের মাধ্যমে এখনও আদর্শ হয়ে আছে। তার আগে অবশ্য হ্যালহেডের ব্যাকরণে বাংলা লিপির প্রথম মুদ্রিত রূপ পাওয়া গিয়েছিল। পরবর্তীকালে শ্রীরামপুর মিশন, বিদ্যাসাগর, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুকুমার রায় প্রমুখ বাংলা লিপির সংস্কার সাধন করে অনেক উন্নয়ন করেছেন। এখন অবশ্য অনেক ফন্ট আবিষ্কার হয়েছে। ফলে বাংলা লিপি আগের থেকে অনেকটাই শিষ্ট ও মার্জিত হয়েছে।

বানান বিভ্রাট বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে একটা বড় সমস্যা। কারণ এখনও যথার্থভাবে বাংলা বানানের আদর্শরূপ জনসমাজে স্বীকৃতি পায়নি। তার কারণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,বাংলা অকাদেমি, আনন্দবাজার পত্রিকা সংস্থা যথাক্রমে তিন ধরনের বাংলা বানান চালু রেখেছে। এইরকম বানান দেখে বা পড়ে পাঠকরা বিভ্রান্ত। সমস্যাটা দাঁড়িয়েছে মূলত তৎসম, অর্ধতৎসম, তদ্ভব ও বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে। এটি ণত্ববিধান-যত্ববিধান, 'ই'-কার ও 'ঈ'-কারের ব্যবহারগত সমস্যার ফলেই হয়েছে। তাই যথার্থ বানানবিধি নির্মাণ করে তা সব ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করাই ভাষা পরিকল্পনার অন্যতম কাজ।

পরিভাষা সৃষ্টির ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় যথেষ্ট সমস্যা আছে। ব্যক্তিগত উদ্যোগ ছাড়াও প্রাতিষ্ঠানিক দিক থেকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা অকাদেমি বিভিন্ন সময়ে পরিভাষা সৃজন করে চলেছে। কিন্তু সমস্ত ভাব প্রকাশের জন্যে বিশেষত বিজ্ঞানবিষয়ক এখনও পরিভাষা যথার্থ রূপ পায়নি। ভাষা পরিকল্পনার একটি মুখ্য দিক যথার্থ পরিভাষার সৃজন। ভাষা পরিকল্পনার একটি বিশেষ দিক অভিধান প্রণয়ন। বহু আগে থেকেই এই কাজটি একটি যথার্থ রূপ পেয়েছে, যার জন্যে সাধারণ অভিধান ছাড়াও একাধিক বিশেষ অভিধানের সৃষ্টি হয়েছে। বাংলা শব্দসমূহের বানান, ব্যুৎপত্তি, উচ্চারণ, পদ পরিচয়, অর্থ, গঠন সবই অভিধানতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত। তাই একটা যথার্থ অভিধান রচনা করলে খুব সহজভাবেই ভাষা পরিকল্পনার অনেক কাজ একসঙ্গে করা সম্ভব হয়।

বাংলা ভাষার মার্জিত ও রুচিসম্পন্ন রূপ তৈরি ভাষা পরিকল্পনার একটা উল্লেখযোগ্য দিক। বিভিন্ন সরকারি কাজ, বেসরকারি কাজের ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট ভাষা প্রয়োজন। এ ছাড়াও শিক্ষার সঙ্গে মাতৃভাষার যোগ পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে প্রথম ভাষা, দ্বিতীয় ভাষা নির্ধারণ করাও এই পর্যায়ের মধ্যে পড়ে। ভাষা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই শিশুদের যথার্থ বাংলা রূপ শেখানোর জন্যে গ্রন্থ রচনা করা আবশ্যিক। এ কাজটি অবশ্য অনেক আগে থেকেই স্কুল বুক সোসাইটি, বিদ্যাসাগর, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ করেছেন। এ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার তো পরবর্তীকালে (১৯৮১) 'কিশলয়' রচনা বা নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে এই কাজটি করেছে। অর্থাৎ শিশুদের প্রথম থেকেই যথার্থরূপে পড়তে শেখানো, যথার্থভাবে উচ্চারণ ও সঠিকভাবে লিখতে শেখানোও ভাষা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত।

পরিশেষে বলা যায় বাংলা ভাষার উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে ভাষা পরিকল্পনার কাজ অবিশ্রান্তভাবে চালিয়ে যেতেই হবে। লিপি পদ্ধতির সুষ্ঠু মার্জিত রূপ যথাযথ রাখতে হবে। তার পাশাপাশি বানানবিধি নির্মাণ, পরিভাষা সৃজন, অভিধান প্রণয়ন, ভাষারূপ তৈরি, আদর্শ শিশু পাঠ্য রচনা ইত্যাদির মাধ্যমেই এই কাজ যথাযথভাবে করা সম্ভব হবে। এই কাজ শুধুমাত্র সরকারি উদ্যোগে করলেই চলবে না। বেসরকারি উদ্যোগ, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, বিদেশি সংস্থা সকলকে একত্রিত করে নতুন উদ্যোগে এই কাজ সম্ভব। তার সঙ্গে

ধর্মকেন্দ্রিক সংস্থাকেও সঙ্গে নিতে হবে। অন্যথায় এই কাজে অনেক বাধা আসতে পারে। বিশেষত বিষয়টা যেন কোনও মতেই সাম্প্রদায়িকতার পর্যায়ে না পৌঁছোয়। এই বিষয়টি সবসময় খেয়াল রাখতে হবে। তবেই সম্ভব হবে আর্দশ ভাষা পরিকল্পনার কাজ।

৪০৪.৩.২.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১) ভাষা পরিকল্পনা বলতে কী বোঝো? ভাষা পরিকল্পনার পটভূমি বুঝিয়ে দাও।

২) ভাষা পরিকল্পনার স্বরূপ আলোচনা করে এর উদ্দেশ্যগুলি লিপিবদ্ধ করো।

৩) কোনও ভাষার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভাষা পরিকল্পনার গুরুত্ব বিচার করো।

৪০৪.৩.২.২ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১) ড. সুখেন বিশ্বাস, 'প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা' (প্রথম খণ্ড), ২০২১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

২) ড. সুখেন বিশ্বাস, 'প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা' (দ্বিতীয় খণ্ড), ২০২২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৩) ড. সুখেন বিশ্বাস, 'ভাষাবিজ্ঞান তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ', ২০২২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৪) শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত, 'বাংলা ভাষা রূপে প্রয়োগে', ২০১৫, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

পত্র : ডিএসই-৪০৪

পর্যায় গ্রন্থ : ৪

একক-১

চমস্কির ভাষাবিজ্ঞান

বিন্যাস ক্রম :

৪০৪.৪.১.১ : নোয়াম চমস্কির সংবর্তনী-সঞ্জননী ব্যাকরণ ও বাংলা অন্বয়তত্ত্ব

৪০৪.৪.১.২ : অব্যাহতি উপাদান

৪০৪.৪.১.৩ : সাধারণ বাক্য

৪০৪.৪.১.৪ : নোয়াম চমস্কি ও সঞ্জননী ব্যাকরণ

- ৪০৪.৪.১.৪.১ : সঞ্জননী ব্যাকরণ ও যুগ্মতত্ত্ব
- ৪০৪.৪.১.৪.২ : বৈশ্বিক ব্যাকরণ—বিশেষ ব্যাকরণ
- ৪০৪.৪.১.৪.৩ : পারঙ্গমতাবোধ—ভাষা ব্যবহার
- ৪০৪.৪.১.৪.৪ : ব্যাকরণসম্মত বাক্য—গ্রহণযোগ্য বাক্য
- ৪০৪.৪.১.৪.৫ : অধোগঠন—অধিগঠন
- ৪০৪.৪.১.৪.৬ : উপাদান শ্রেণি
- ৪০৪.৪.১.৪.৭ : ব্যাকরণ সম্মত সংবর্তন

৪০৪.৪.১.৫ : বাংলা ভাষার সংবর্তন

৪০৪.৪.১.৬ : বাক্য সংবর্তন

৪০৪.৪.১.৭ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৪০৪.৪.১.৮ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৪০৪.৪.১.১ : নোয়াম চমস্কির সংবর্তনী-সঞ্জননী ব্যাকরণ ও বাংলা অন্বয়তত্ত্ব

পৃথিবীর প্রাণীজগতে একমাত্র মানুষই কথা বলতে পারে। শিশু যেমন বড় হতে হতে তার চারপাশের লোকজনদের কথাবার্তা শুনতে শুনতে মাতৃভাষা শিখে ফেলে তেমনিভাবেই যখন আমরা বড় হয়ে দেখি ব্যাকরণ না শিখেই আমরা ভাষার ব্যাকরণ মোটামুটিভাবে ব্যবহার করতে পারছি—তখন অবাক হয়ে যাই বই কি। কিন্তু আবার হবার ব্যাপার নয়। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানী নোয়াম চমস্কি (Noam Abraham Chomsky) জানিয়েছেন আমাদের মাথার মধ্যে রয়েছে ভাষা শেখার কৌশল (Language Acquistion Devise)। একে সংক্ষেপে LAD বলে। এরই ফলে জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে আমরা ভাষা শিখতে থাকি। স্নায়ুবিজ্ঞানী এবং স্নায়ুচিকিৎসকগণ আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে অবস্থিত ভাষা এলাকাগুলিকে চিহ্নিত করেছেন। কান দিয়ে শোনার অনুভূতি—দেখার অনুভূতির পাশাপাশি রয়েছে কানে শোনার মনস্তত্ত্ব—চোখে দেখার মনস্তত্ত্ব। এগুলির সঙ্গে ভাষার অর্থাৎ কথা বলা ও লেখার কেন্দ্রগুলি যুক্ত হয়। আমাদের বাগ্‌যন্ত্রকে সক্রিয় করে তোলে স্নায়ু। আমরা কথা বলি।

কথা বলাই ভাষার ব্যবহার। এই ভাষার সবচেয়ে বড় একক (Unit) হল—বাচন (Discourse)। একটি বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে বা কোনো একটি প্রসঙ্গকে ধরে তৈরি হয় বাচন। বাচনকে বিশ্লেষণ করলে পাই বাক্য (Sentence)। প্রথানুসারী (Traditional) ব্যাকরণে বাক্য বলতে যোগ্যতা-আকাঙ্ক্ষা-আসক্তিযুক্ত পদসমষ্টিকে বোঝায়। পাশ্চাত্য ও ভারতীয় ব্যাকরণেও পূর্ণ অর্থজ্ঞাপক পদসমষ্টিকে বাক্য বলে। এই বাক্যকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যাবে পদগুচ্ছ (Phrase)। কোনো একটি প্রধান পদকে অবলম্বন করে এক বা একাধিক পদের সমষ্টি তৈরি করে পদগুচ্ছ। পদগুচ্ছ আর বাক্যখণ্ড (Clause) এক নয়। একটি সরল (Simple) বাক্য আর একটি বাক্যখণ্ড গঠনগত বিচারে একই। পদগুচ্ছকে বিশ্লেষণ করলে পাবো পদ (Grammatical Word)। সংস্কৃত ব্যাকরণে বলা হয়েছে 'সুপ-তিঙন্তং পদম্'। অর্থাৎ শব্দবিভক্তি (সুপ্) ও ক্রিয়াবিভক্তি (তিঙ্) যুক্ত শব্দ-ই হল পদ। যে শব্দ (Word) বাক্যমধ্যে ব্যবহৃত হবার যোগ্যতা রাখে তাকেই পদ বলা হয়। একটি পদ এক বা একের বেশি রূপ (Morph) জুড়ে তৈরি হয়। রূপগুলি তৈরি হয় এক বা একাধিক স্বনিম (Phoneml) জুড়ে। সাধারণত স্বনিম-ই ক্ষুদ্রতম একক। কিন্তু তত্ত্বগতভাবে স্বনিমের চেয়েও ক্ষুদ্রতর একক আছে। এক বা একাধিক স্ব-লক্ষণ (Distinctive Features) যুক্ত হয়ে স্বনিম গঠিত হয়। বৈয়াকরণগণ ভাষা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এইসব নানাবিধ গঠনের কথা বলেছেন। এখানে আমরা অন্বয়তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করব। এই আলোচনার বাক্যকে সবচেয়ে বড় একক হিসেবে ধরে গঠনগত বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। ব্যাকরণগত বড় একক বাচন নয়, বাক্য-ই।

প্রথানুসারী ব্যাকরণে একটি বাক্যকে উদ্দেশ্য (Subject) ও বিধেয় (Predicate) এই দুভাগে ভাগ করা হত। যেভাবে উদ্দেশ্য ও বিধেয় ভাগ করা হত সেখানে গঠনগত বিন্যাসের অসুবিধা বিশেষভাবে দেখা যেত। যেমন, 'আমি তোমাকে ডাকলাম' এই বাক্যে যেমন সহজে উদ্দেশ্য-আমি এবং বিধেয়-তোমাকে

ডাকলাম ভাগ করা যায় তেমন সহজে 'আজ আর ওখানে সে যাবে না'—কে ভাগ করা যায় না। এখানে 'সে' উদ্দেশ্য হলে তার আগে কিছুটা অংশ বিধেয় এবং পরেও বিধেয় কিছুটা অংশ জুড়ে রয়েছে। ফলে, উদ্দেশ্য-বিধেয় সংগঠন বক্তব্যধর্মী, গঠনধর্মী নয়।

৪০৪.৪.১.২ : অব্যাহতি উপাদান

বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানীগণ বাক্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ছোট ছোট এলাকায় আন্বয়িক সম্পর্ককে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। সেইভাবে তাঁরা দুটি করে উপাদান যুক্ত করে অব্যবহিত উপাদান সংগঠনের (Immediate Constitution Structure) কথা বলেন। অব্যবহিত উপাদান সংগঠনের ক্ষেত্রে দুটি করে উপাদান যুক্ত হয়ে ক্রমোচ্চ স্তর নির্মাণ করতে করতে বাক্যস্তরে উপনীত হয়। প্রথমে একটি উদাহরণ নিয়ে বিষয়টি বোঝানো যাক।

'আমি আজ তাদের সঙ্গে যাব না'—এই বাক্যে 'যাব'-র সঙ্গে 'না' এবং 'তাদের' ও 'সঙ্গে'-র অন্বয়িক সম্পর্ক ঘনিষ্ট। ফলে উপাদান দুটি যুক্ত হয়ে একটি করে উপাদানে পরিণত হবে। যথা—'যাব না' ও 'তাদের সঙ্গে'। এবার এই দুটি উপাদান যুক্ত হয়ে তৈরি করবে 'তাদের সঙ্গে যাব না'—এই একটি উপাদান। এর সঙ্গে 'আজ' যুক্ত হয়ে 'আজ তাদের সঙ্গে যাব না, এই একটি উপাদানে পরিণত হবে। এরপর, 'আমি' ও 'আজ তাদের সঙ্গে যাব না,—এই দুটি উপাদান যুক্ত হয়ে একটি উপাদানে পরিণত হবে। এইভাবে পদস্তর থেকে ক্রমোচ্চ স্তর গঠন করতে করতে সর্বোচ্চ স্তর—বাক্যে উপনীত হতে হবে। একেই অব্যহতি উপাদান গঠন বলে। যেভাবে এই অব্যহতি উপাদান দেখানো হয় তা এখানে দেখানো হল—

আমি	আজ		তাদের	সঙ্গে	যাব	না	* স্তর ১
আমি	আজ		তাদের সঙ্গে		যাব	না	* স্তর ২
আমি	আজ	তাদের সঙ্গে যাব না					* স্তর ৩
আমি	আজ তাদের সঙ্গে যাব না						* স্তর ৪
আমি আজ তাদের সঙ্গে যাব না							* স্তর ৫

এখানে সমান্তরালভাবে প্রতিটি পদের সঙ্গে প্রতিটি পদের পাশাপাশি সম্পর্ক হল—অব্যবহিত সম্পর্ক। আবার প্রতিটি স্তরের সঙ্গে পরবর্তী স্তরের সম্পর্ক অব্যবহিত সম্পর্ক। স্তর-২ যেমন স্তর-১ এর অব্যবহিত পরবর্তী স্তর তেমনি তা স্তর-৩ এর অব্যবহিত পূর্ববর্তী স্তর। কেবল স্তর-১ এর সঙ্গে স্তর-৫ এর সম্পর্ক চূড়ান্ত উপাদান সংগঠন সম্পর্ক (Ultimate Constitute Construction)। দুটি করে উপাদান এইভাবে যুক্ত হয়ে অব্যবহিত উপাদান সংগঠন তৈরি করছে।

একই স্তরের দুটি উপাদান বা তার চেয়ে বেশি উপাদান একই সঙ্গে অন্য একটি উপাদানের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে। যেমন, 'কাগজ-বই-খাতা-কলম' এগুলি একই স্তরের উপাদান। এগুলি একই সঙ্গে একটি উপাদানের মতো ভূমিকা নেবে। আন্বয়িক গঠন তৈরি করবে একই সঙ্গে। অন্য একটি উপাদানের সঙ্গে যুক্ত হবে। যেমন—

ক.

সে	কাগজ	বই	খাতা	কলম	কিনল
সে	কাগজ বই খাতা কলম কিনল				
সে কাগজ বই খাতা কলম কিনল					

সংযোজক অব্যয়, ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাঁকানো রেখা দিয়ে সংযুক্তি দেখানোর কথা হকেট (Hockett) বলেন।

খ.

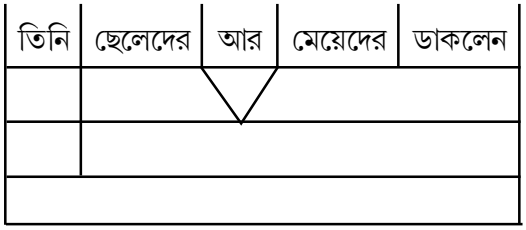

দ্ব্যর্থ বোধকতা অনেক সময় সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। হকেট একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন 'Stout major's wife'-এই বাক্যে কে 'stout'? 'major's wife' কে? সমাধান সূত্র হিসেবে বলেছেন যেখানে শ্বাসাঘাত জোরে পড়ছে সেখানেই এই অর্থবোধের সূত্র পাওয়া যাবে। যদি 'Stout'-এর ওপর শ্বাসাঘাত পড়ে তবে 'major's wife' কে 'stout' বোঝাবে। আর 'Major' এর ওপর শ্বাসাঘাত পড়লে 'stout' বোঝাবে 'major' কে। বাংলা ভাষায় শ্বাসাঘাত প্রাধান্য পায় না। তাই দ্ব্যর্থবোধক বাক্যগুলির অর্থ নির্ণয় করা দুরূহ হয়ে পড়ে। 'বড়ো সুন্দর গোলাপ'—এই বাক্যে 'গোলাপ'-টি বড়ো বোঝাচ্ছে নাকি 'সুন্দর'-এর 'বিশেষণ' হিসেবে 'বড়ো' ব্যবহৃত হচ্ছে তা বোঝা যায় না। এখানে অব্যবহিত উপাদানে বিশ্লেষণ করার সময় দুটি সম্ভাবনাই প্রাধান্য পেতে পারে।

ক.

বড়ো	সুন্দর	গোলাপ

খ.

বড়ো	সুন্দর	গোলাপ

অব্যবহিত উপাদান বিশ্লেষণের মাধ্যমে আন্বয়িক গঠনগুলি সম্পর্কে ধারণা তৈরি হতে থাকে। একই শ্রেণির পদগুলি কীভাবে পদগুচ্ছ তৈরি করে তা বোঝা যায়। বর্ণনামূলক (Descriptive) ভাষাবিজ্ঞানীগণ এভাবেই বাক্যের বিশ্লেষণের মাধ্যমে আন্বয়িক সম্পর্ক নির্ণয় করবার চেষ্টা করলেন। লিওনার্ড ব্লুমফিল্ড (Leouard Blommfield), হকেট (Hockett), গ্লিসন (Gleason), কুইনে (Quine), হ্যারিস (Harris) প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানীর ভাবনাচিন্তায় এই অব্যবহিত উপাদান বিশ্লেষণ বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল। ব্লুমফিল্ডের ছাত্র

হিসেবে নোয়াম চমস্কি (Noam Chomsky) এই বিশ্লেষণী পদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট হন। প্রথম দিকে তিনি বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানীদের মতো গবেষণা আরম্ভ করলেও পরবর্তীকালে স্বতন্ত্রপথ নির্মাণ করেছিলেন। সে বিষয়ে যথাস্থানে আলোচনা করা হবে। এখানে কিছু অব্যবহিত উপাদানের বিশ্লেষণ ও সংযুক্তিকরণ দেখানো যেতে পারে।

৪০৪.৪.১.৩ : সাধারণ বাক্য

স্তর

১	তিনি	ওই	পোড়ো	বাড়িতে	কাল	কিম্বা	পরশু	সারারাত	ধরে	বড়ো	বড়ো	মশার	কামড়ে	রাত্রি	কাটিয়েছেন
২															
৩															
৪															
৫															
৬															

এই বিশাল বাক্যটি মাত্র ছ'টি স্তরে যুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু, এমন বাক্য যদি পাওয়া যায় যেখানে বাক্যের আন্বয়িক সম্পর্ক ধরে ঠিকঠাক বিন্যাস লাভ করা যাবে না। তাহলে কি করা হবে সেখানে? যেমন, 'ওই পোড়ো বাড়িতে তিনি কাল যাবেন'—এই বাক্যটি। এখানে বাক্যের মাঝখানে 'তিনি' পদটি অবস্থিত। সেখানে আন্বয়িক সম্পর্ক দেখানোর জন্য সংযোগসাধন করছে না এমন উপাদানকে পৃথক করে দেখানো যেতে পারে। যেমন—

স্তর

১	ওই	পোড়ো বাড়িতে	তিনি	কাল	যাবেন
২					
৩					
৪					
৫					

স্তর-৪ এর বিন্যাস স্পষ্ট হয়ে গেল 'তিনি' এই উপাদানকে বাদ রেখেই 'ওই পোড়ো বাড়িতে'— এই উপাদানটির সঙ্গে 'কাল যাবেন' উপাদানটি যুক্ত হচ্ছে। আবার 'তিনি' এই উপাদানটি 'ওই পোড়ো বাড়িতে কাল যাবেন' এই উপাদানটির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে স্তর-৫ এ। এভাবেই অব্যবহিত উপাদানগুলি আন্বয়িক গঠনে যুক্ত হয়ে হয়ে একটি বড় গঠন তথা বাক্য নির্মাণ করে। অব্যবহিত উপাদানে সব বাক্য বিশ্লেষণে সম্ভব নয়। পরন্তু, মুখের ভাষা নিয়ে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানীগণ কাজ করেছেন। মুখের ভাষায় জটিল গঠন সবসময়ে এই অব্যবহিত উপাদান বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখানো সম্ভব নয়। আর এই কারণেই নোয়াম চমস্কি প্রবর্তিত সঞ্জননী ব্যাকরণের পদগুচ্ছ সংগঠন সূত্র বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়।

৪০৪.৪.১.৪ : নোয়াম চমস্কি ও সঞ্জননী ব্যাকরণ

আমেরিকার ভাষাবিজ্ঞানী নোয়াম চমস্কির জন্ম ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে। তিনি মূলত ব্লুমফিল্ডের বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান পদ্ধতি নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন। গঠনমূলক (Structural) ভাষাবিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ ছিল তাঁর। ভাষাবিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব এবং অঙ্ক ছিল তাঁর পাঠ্য বিষয়। তিনি একসময়ে আচরণবাদী (Behaviourist) ভাষাবিজ্ঞানীদের ভাবনাচিন্তা থেকে একটু আলাদা ভাবে ভাবনাচিন্তা শুরু করলেন। ব্লুমফিল্ডের পথ থেকে সরে এলেন। বি. এফ. স্কিনার (B. F. Skinner)-এর 'Verbal Behaviour' গ্রন্থের তীব্র সমালোচনা করলেন। এখান থেকেই বলা চলে তাঁর ভাবনাচিন্তা নতুন পথ অবলম্বন করেছে তা স্পষ্ট হয়ে যায় সকলের কাছে। ১৯৪১ থেকেই তিনি অবশ্য তাঁর নতুন পথে যাত্রা শুরু করেননি। এই সময়ে তিনি স্নাতকোত্তর শ্রেণির ছাত্র হিসেবে হিব্রু ভাষার রূপ-স্বনিম তত্ত্ব (Morphophonemics of Modern Hebrew) নিয়ে কাজ করেছিলেন। অন্বয় নিয়ে ভাবনা শুরু হয় আর দুবছর পরে। ১৯৪৩-এ পত্রিকায় (Journal of Symbolic Logic, vol-18) আন্বয়িক বিশ্লেষণের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেন। প্রতীকী যুক্তিবিজ্ঞানের (Symolic Logic) পরিভাষা ও সূত্র প্রয়োগ করেন এই প্রবন্ধে (Systems of Syntactive Analysis)। ১৯৫৪-তে একাধিক প্রবন্ধ লিখলেন অন্বয় নিয়ে। এ টি গ্রন্থের রচয়িতাও তিনি। 'The Logical Structure of Linguistic Theory' (১৯৫৫)- এই মিমিয়োগ্রাফ গ্রন্থটি বেশি লোকের চোখে পড়েনি। পরবর্তীকালে ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হলে বোঝা গিয়েছিল যে সংবর্তনী ব্যাকরণের সূত্রপাত এই ১৯৫৫ থেকেই ঘটে গেছে। আসলে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'Syntactic Structures' গ্রন্থটি তাঁর তত্ত্বকে বিশেষভাবে নানা দিকে ছড়িয়ে দেয়। ১৯৫৭-র 'Syntactic Structures' গ্রন্থে বাক্য বিশ্লেষণ করার তিনটি মডেল দিলেন। এই তিনটি মডেল আসলে তিন ধরনের ব্যাকরণ তৈরি করল।

ক. Finite State Grammar

খ. Phrase Structure Grammar

গ. Transformational Grammar

কীভাবে শব্দ জুড়ে জুড়ে আন্বয়িক গঠন তৈরি করা হয় সে বিষয়টি 'Finite State Grammar'-এর মডেলে রয়েছে। 'Phrase Structure Grammar'-এর মডেলটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই মডেলের মধ্যে বাক্যগঠনের যে দিকগুলি চিহ্নিত হয়েছে সেই দিকগুলি নিয়েই আন্বয়িক সূত্র নির্মিত হয়েছে। পরে ১৯৬৫-র তত্ত্বে 'Phrase Structure'-এর ব্যাকরণকে একটু পরিবর্তন করে 'Phrase Structure Rule' [PSR] হিসেবে দেখেছেন। 'Transformational Grammar'-এর ক্ষেত্রে যে নূতনত্ব দেখালেন তিনি তা সকলের কাছে বিশেষ আগ্রহ তৈরি করেছিল। চমস্কির ১৯৫৭-র এই গ্রন্থটির তত্ত্ব ১৯৫৭-র তত্ত্ব হিসেবে প্রচার লাভ করে। পরে ১৯৫৭-র তত্ত্বকে নানাভাবে পরিমার্জিত করে ১৯৬৫-তে 'Aspects of the Theory of Syntax' গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থটির তত্ত্ব তাঁর সঞ্জননী ব্যাকরণের (Generative Grammar) মান্যতত্ত্ব বা Standard Theory বা সংক্ষেপে ST হিসেবে পরিচিত।

১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন, 'Language and Mind' গ্রন্থটি। মনোভাষাবিজ্ঞানের (Psycholinguistics) আলোচনায় এই গ্রন্থটির ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। চমস্কির মান্যতত্ত্ব পরবর্তীকালে নানাভাবে সমালোচিত হয়। তিনি নিজেই এর নানা পরিবর্তন করতে থাকেন। সত্তর দশকের মাঝামাঝি এই তত্ত্বকে সম্প্রসারিত করে Extended Standard Theory বা EST তৈরি করেন। ১৯৮১-তে প্রকাশ করেন 'Lectures on Government and Binding' গ্রন্থটি। এখানে সঞ্জননী তত্ত্বের একটি সম্পূর্ণ রূপ তৈরি করতে চেয়েছিলেন। এখানে সঞ্জননী তত্ত্বের 'Principal and Parameter' বা 'P & P' তত্ত্ব হিসেবে দেখলেন। তৈরি হল 'Revised Extended Standard Theory' বা REST তত্ত্ব। এখানে তিনি বৈশ্বিক ব্যাকরণের (Universal Grammar) সূত্র নির্মাণ করলেন।

সঞ্জননী তত্ত্বের গোড়ার কথা হল—বাক্য তৈরি করা বা সৃষ্টি করা। ভাষাতত্ত্বের (Philology) কাজকর্ম চলেছিল লিখিত নিদর্শনের ওপর নির্ভর করে। ভাষাবিজ্ঞান (Linguistics) মূলত মুখের ভাষাকেই গুরুত্ব দেয়। আমরা যেভাবে ভাষা শিখি—ভাষা ব্যবহার করি তা আসলে বাক্য সঞ্জনন (Generation) করা। চমস্কি এই বাক্য সঞ্জননের কথা বললেন। বাক্যের দুটি গঠনের কথা বললেন। একটি হল আদর্শ গঠন, অন্যটি হল প্রকৃত গঠন। ভাষার অন্তর্নিহিত ব্যাকরণের কাঠামোকে মেনে নিয়েই তৈরি হয় বাক্যের আন্বয়িক কাঠামো। এই কাঠামোকেই অধোগঠন (Deep Structure) নাম দিয়েছেন তিনি। সীমাবদ্ধ আন্বয়িক গঠন তৈরি করে অসংখ্য বাক্য। এই উচ্চারিত বাক্যগুলি হল অধিগঠন (Surface Structure)। অধোগঠন থেকে অধিগঠনে যাওয়ার সময় যে পরিবর্তনগুলি ঘটে সেগুলিকে বলে সংবর্তন (Transformation)। এইভাবে তিনি তৈরি করলেন সঞ্জননী সংবর্তনী ব্যাকরণ (Transformational Generative Grammar)। একে সংক্ষেপে TG Grammar বলা হয়।

চমস্কি সঞ্জননী ব্যাকরণকে কতকগুলি নিয়মের পদ্ধতি হিসেবে দেখেছেন। 'Aspects of the Theory of Syntax' (1965) গ্রন্থে তিনি তিনটি প্রধান উপাদান শ্রেণির বিন্যাস কক্ষ আছে বলে জানিয়েছেন। আন্বয়িক কক্ষ ও ধ্বনিতত্ত্বগত কক্ষের সঙ্গে শব্দার্থতত্ত্বের কক্ষের কথা জানিয়েছেন।

> "This system of rules can be analyzed into three major components of generative grammar : The syntactic, phonological and semantic components" [p-16]

১৯৫৭-র তত্ত্বে তিনি শব্দার্থতত্ত্বের কথা বলেননি। বিশেষ গুরুত্বও দেননি। পরবর্তীকালে ছাত্র ও সহকর্মীদের কথায় তিনি শব্দার্থতত্ত্বকে গুরুত্ব দেন। চমস্কি সঞ্জননী-সংবর্তনী ব্যাকরণের প্রক্রিয়ার কথা যেভাবে বলেছিলেন তা একটি ছকের মাধ্যমে দেখানো হল—

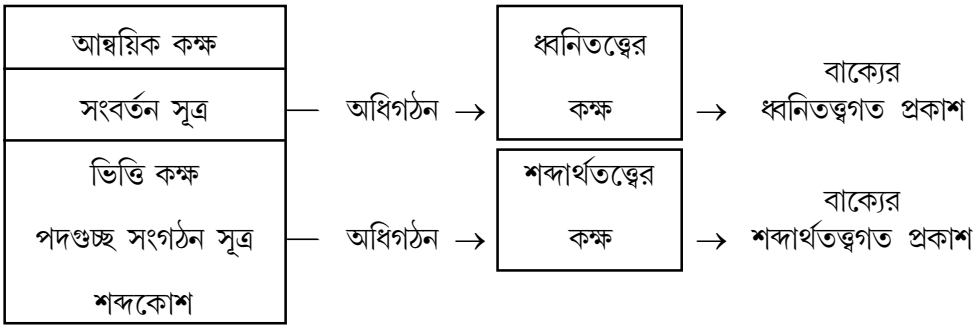

ভিত্তি কক্ষে (Base) রয়েছে দুটি বিষয়। একটি হল—শব্দকোশ (Lexicon)। এখান থেকে শব্দ নিয়ে তৈরি হয় বাক্য। পদগুচ্ছ সংগঠন সূত্র তৈরি করে একটি প্রাথমিক গঠন। এই কক্ষের সঙ্গে অধোগঠনের যোগ রয়েছে শব্দার্থতত্ত্বের কক্ষের সঙ্গে। সেখানে থেকেই বাক্যের অর্থবোধ ঘটে। অন্যদিকে সংবর্তন সূত্রের মাধ্যমে আন্বয়িক নিয়মাবলী আন্বয়িক কক্ষ থেকে যুক্ত হয়ে তৈরি করছে অধিগঠন। এই অধিগঠন ধ্বনিতত্ত্বের কক্ষের মাধ্যমে ধ্বনিতত্ত্বের নিয়ম যুক্ত হয়ে উচ্চারিত বাক্যরূপে প্রকাশিত হচ্ছে। এইভাবে একদিকে অধোগঠন অন্যদিকে অধিগঠন একদিকে শব্দের বা বাক্যের অর্থবোধ অন্যদিকে ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রকাশ নিয়ে বাক্যসঞ্জনন ক্রিয়া চলতে থাকে। একই নিয়মের দ্বারা তৈরি হতে থাকে অসংখ্য বাক্য।

৪০৪.৪.১.৪.১ : সঞ্জননী ব্যাকরণ ও যুগ্মতত্ত্ব

নোয়াম চমস্কির সঞ্জননী ব্যাকরণের প্রধান সূত্রগুলি দুটি করে তত্ত্ব নিয়ে একটি তত্ত্বরূপে প্রতিষ্ঠিত। একটি তত্ত্ব আর একটির পরিপূরক। একে যুগ্মতত্ত্ব হিসেবে দেখা যেতে পারে। প্রধান চারটি যুগ্মতত্ত্ব তাঁর সঞ্জননী ব্যাকরণের ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করবে। যথা—

ক. বৈশ্বিক ব্যাকরণ (Universal Grammar) ও বিশেষ ব্যাকরণ (Particular Grammar)

খ. পারঙ্গমতাবোধ (Competence) ও ভাষা ব্যবহার (Performance)

গ. ব্যাকরণসম্মত বাক্য (Grammatical Sentence) ও গ্রহণযোগ্য বাক্য (Acceptable Sentecne)

ঘ. অধোগঠন (Deep Structure) ও অধিগঠন (Surface Structure)

এক এক করে বিষয়গুলি আলোচনা করা হল। মনে রাখতে হবে, এগুলি পরিপূরক যুগ্ম তত্ত্ব।

৪০৪.৪.১.৪.২ : বৈশ্বিক ব্যাকরণ—বিশেষ ব্যাকরণ

পৃথিবীর সব ভাষার ব্যাকরণ এক কী করে হতে পারে, এমন প্রশ্ন বহুবার উঠেছে। এইসব জটিলতার মধ্যে না গিয়ে সহজ করে দেখা যাক বৈশ্বিক ব্যাকরণ (UG) বলতে কী বোঝায়। যে-কোনো ভাষারই রয়েছে অন্তর্গত গঠন। সেই গঠন বোঝা যায় বাক্যের উপাদান শ্রেণি বিশ্লেষণ করলে। যেমন, কোনো কিছুর নাম বোঝালে তা অবশ্যই নামপদ হবে। কাজ করা বোঝালে হবে ক্রিয়া। কোনো বস্তু বা বিষয়ের গুণ-দোষ ইত্যাদি বোঝালে হবে বিশেষক (modifier)। এইভাবে বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া ইত্যাদি পদবিভাগ সব ভাষারই যেমন আছে তেমনি পদগুলির আন্বয়িক বিন্যাসও রয়েছে। যেমন বিশেষণ নামপদ বা ক্রিয়াপদের সঙ্গে যুক্ত হবে। আগে হতে পারে পরেও হতে পারে। যেমন, 'যাব না'—তে 'না' ক্রিয়া বিশেষণ ক্রিয়ার পরে বসেছে। 'জোরে যাবে'—তে ক্রিয়ার আগে বসেছে বিশেষণ। 'দেবী বিশালাক্ষ্মী'-তে বিশালাক্ষ্মী বিশেষণের ভূমিকা পালন করছে। আবার চমস্কি বৈশ্বিক ব্যাকরণে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন শিশুর ভাষা শেখার পদ্ধতিকে। ভাষা শেখার তত্ত্বের মধ্যেই রয়েছে বৈশ্বিক ব্যাকরণের ধারণা। পৃথিবীর সব ভাষাই একই পদ্ধতিতে শেখা হয়। একে বলা হয় LAD বা Language Acquisition Device অর্থাৎ, ভাষা গ্রহণের পদ্ধতি। ভাষার অভ্যন্তরীণ গঠন এই LAD-এর দ্বারাই আমরা শিখে যাই। আমাদের মাথার মধ্যে তৈরি হয় Language Faculty বা ভাষার এলাকা। 1972 খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'Language and Mind' গ্রন্থে চমস্কি এই ধারণা বিশেষভাবে ব্যক্ত করেছেন। বৈশ্বিক ভাষা বা বৈশ্বিক ব্যাকরণ বিষয়ক ধারণা মানুষের সংজ্ঞার মধ্যে অবস্থিত। 1986-তে প্রকাশিত 'Knowledge of Language : Its Nature, Origin and Use' গ্রন্থে তিনি জানান, আমাদের জন্মসূত্রে পাওয়া ভাষা শেখার শক্তিই বৈশ্বিক ব্যাকরণের ধারণাকে স্পষ্ট করে তোলে। অর্থাৎ সংজ্ঞার মধ্যে অবস্থিত ভাষা বিষয়ক ধারণাই হল বৈশ্বিক। একটি বিশেষ ভাষার সঙ্গে অন্য একটি বিশেষ ভাষার ব্যাকরণের পার্থক্য থাকতেই পারে। কিন্তু উভয় ভাষার ব্যাকরণের মূলসূত্রগুলি এক। যেমন ধরা যাক, বাংলা ভাষার ব্যাকরণের সঙ্গে চিনা ভাষার ব্যাকরণের তফাৎ অনেক আছে। কিন্তু উভয় ব্যাকরণের গঠনগত ও বিশ্লেষণ করার জন্য প্রয়োজনীয় মূল সূত্রগুলির মধ্যে একটি বিশ্বজনীনতা লক্ষ করা যায়।

যে-কোনো ভাষার ব্যাকরণ হল বিশেষ ব্যাকরণ (Particular Grammar)। যেমন, বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, গ্রিক ভাষার ব্যাকরণ, তামিল ভাষার ব্যাকরণ—এসবই আলাদা আলাদা ভাষার ঐতিহ্য বহন করে সেই ভাষার অন্তর্গত কাঠামোর ওপর নির্ভর করে রচিত। এগুলি এক একটি বিশেষ ভাষার ব্যাকরণ হিসেবেই গ্রহণ করা হবে।

এককথায় বলতে গেলে, যে সব সূত্র পৃথিবীর সব ভাষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেমন ভাষা শেখার পদ্ধতি, অধোগঠন (Deep Structure) সম্পর্কিত যাবতীয় ধারণা তা বৈশ্বিক ব্যাকরণের মূল এলাকা। আর এই বৈশ্বিক ব্যাকরণের সূত্র মেনে বিশেষভাবে বিশেষ শব্দভাণ্ডার, আন্বয়িক নিয়ম ও ধ্বনিতত্ত্বের নিয়ম দিয়ে তৈরি হয় বিশেষ ব্যাকরণ।

৪০৪.৪.১.৪.৩ : পারমঙ্গমতাবোধ—ভাষা ব্যবহার

মানুষের মনের মধ্যে রয়েছে অসীম সম্পদ। সেই মনের অতলে অবস্থিত ভাষা সম্পর্কিত যে সম্পদ রয়েছে তার ওপর আলো ফেলাই সঞ্জননী ব্যাকরণের মূল কাজ বলে মনে করেন চমস্কি। তিনি মনে করেন ভাষা হল মানুষের মনের দর্পণ। আমরা আমাদের পরিবেশ থেকে ভাষা শিখি। সে ভাষা মূলত মাতৃভাষা। তাই ব্যক্তির মনের মধ্যে তার মাতৃভাষা সম্পর্কিত যে ধারণা থাকে, মাতৃভাষার যে শব্দভাণ্ডার, যে গঠন পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকে তাকে এককথায় পারঙ্গমতাবোধ (Competence) বলে। 1965-তে চমস্কি যে পারঙ্গমতাবোধের কথা বলেন তার সঙ্গে ভাষা ব্যবহার (Performance) জড়িয়ে থাকে।

ভাষা সম্পর্কিত যাবতীয় জ্ঞান বা ধারণা হল পারঙ্গমতাবোধ। কথা বলতে পারা, শুনে তা বুঝতে পারা ইত্যাদি ক্ষমতা হল—পারঙ্গমতাবোধ। আর কথা বলা বা শোনা হল ভাষা ব্যবহার। পারঙ্গমতাবোধ আর ভাষা ব্যবহারের সঙ্গে এই সম্পর্ক আছে কিন্তু তার মানে এই নয় যে, ভাষা ব্যবহার আর পারঙ্গমতাবোধ এক। আমাদের কথা বলার সময় অর্থাৎ ভাষা ব্যবহারের সময় নানা রকমের বাধা চলে আসতে পারে। যেমন, কথা বলতে বলতে খেই হারিয়ে যেতে পারে। ঠিকমত গুছিয়ে বলতে না পারা—এলোমেলো বলা। বলতে বলতে ভুলে যাওয়া। ঠিকঠাক না বলা বা ভুল বলা। কোনো বিষয় বলতে গিয়ে মনোযোগ হারিয়ে ফেলা। হঠাৎ অন্য কোনো বিষয়ে আকৃষ্ট হয়ে কথার মাঝখানে সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন। কথা বলার সময় তোতলামি করা-পেকগেলা-গলা শুকিয়ে যাওয়া-নার্ভাস হওয়া-ভুল উচ্চারণ করা ইত্যাদি বিষয়ও বাধার সৃষ্টি করে। তাই ভাষা ব্যবহারের ভিতর দিয়ে সরাসরি বক্তার পারঙ্গমতাবোধের পরিচয় পাওয়া যায় না।

প্রকৃত ভাষা ব্যবহার হল আদর্শ বক্তা—শ্রোতার কথা বলা। সেখানে স্মৃতিগত সীমাবদ্ধতা থাকবে না। এলোমেলো বলা—ছড়িয়ে বলা থাকবে না। কথার মাঝখানে মনোযোগ বদলানো চলবে না। কোনো কিছু ভুল বলবে না। কোনো ধরনের বাক্-বিচ্যুতি ঘটবে না। আদর্শ ভাষা ব্যবহারের সঙ্গে প্রকৃত পারঙ্গমতাবোধের সম্পর্ক তৈরি হয়। বলা বাহুল্য, আদর্শ ভাষা ব্যবহারের সঙ্গে বাস্তবে কথা বলার মধ্যে পার্থক্য থেকেই যায়।

অনেকে মনে করেন Saussure-এর Langue ও Parole-এর ধারণার সঙ্গে চমস্কির Competence-Performance-এর ধারণার মিল আছে। প্রকৃতপক্ষে তা নয়। চমস্কি Humboldt-এর 'Underlying Competence, এর ধারণা থেকেই এই পারঙ্গমতাবোধের ধারণা পেয়েছেন। একথা চমস্কি নিজেই জানিয়েছেন তাঁর 'Aspects of the Theory of Syntax' গ্রন্থের ভূমিকায়। যে-কোনো ভাষার সঞ্জননী ব্যাকরণ আদর্শ

বক্তা-শ্রোতার পারঙ্গমতাবোধকে বিশ্লেষণ করে দেখাবে। বক্তা-শ্রোতার ভাষা ব্যবহারকে ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করবে। সঞ্জননী ব্যাকরণের প্রধান কাজ হল—আদর্শ বক্তা-শ্রোতার পারঙ্গমতাবোধ ও ভাষা ব্যবহারকে বিশ্লেষণ করে ব্যাকরণের সূত্র নির্মাণ।

দুধরনের পারঙ্গমতাবোধের কথা চমস্কি বলেছেন—(ক) Grammatical বা ব্যাকরণ সম্পর্কিত পারঙ্গমতাবোধ এবং খ. Pragmatic বা প্রয়োগমূলক পারঙ্গমতাবোধ। ব্যাকরণ সম্পর্কিত পারঙ্গমতাবোধকে ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ক (Linguistic) পারঙ্গমতাবোধ বলা হয়। সাধারণভাবে বক্তার স্বজ্ঞায় দুধরনের জ্ঞান কাজ করে। একটি হল—বাক্যটির গঠন ঠিক আছে কিনা তা দেখা। অন্যটি হল—বাক্যের গঠন সম্পর্কিত বোধ অর্থাৎ ধ্বনি ও ধ্বনিবিজ্ঞানের ধারণা, রূপ বিষয়ক ধারণা, আন্বয়িক গঠন সম্পর্কে ধারণা ও অর্থ বা শব্দার্থ সম্পর্কে ধারণা। সবার মধ্যে এই ধারণাগুলির সবকটিই অল্পবিস্তর থাকে।

সংযোগমূলক (Communicative) বা প্রয়োগমূলক (Pragnatic) পারঙ্গমতাবোধের কথা 1966 খ্রিস্টাব্দে Dell Hymes আমাদের কাছে জানান। তিনি বলেন, বক্তার বাক্য সঞ্জননের ক্ষেত্রে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিকটি লক্ষ করা প্রয়োজন। চমস্কি প্রয়োগমূলক পারঙ্গমতাবোধের ক্ষেত্রে ভাষা ব্যবহারের তত্ত্বকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। যেমন, 'Today was a disaster'-এই বাক্যে যে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে তা পূর্ববর্তী ধারণার উপর নির্ভর করে আছে। আগের তথ্য না জানলে এই বাক্যের অর্থ জানা সম্ভব হয় না। ফলে, বাক্যের ব্যবহারের দিকটি এখানে প্রাধান্য পায়।

সমাজভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সংযোগমূলক পারঙ্গমতাবোধের প্রধান তিনটি দিক জানা যায়।

ক. মৌখিক সঙ্কেত এবং মৌখিক নয় এমন সঙ্কেত। ভাষাতাত্ত্বিক জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে এই ধরনের পারঙ্গমতাবোধ।

খ. ঠিকমতো কথা বলা ও বিষয় অনুসারে কথা বলা। একে আদান-প্রদান বিষয়ক ক্ষমতা বলে।

গ. সমাজের গঠন ও তার নানা বৈশিষ্ট্য ঠিকমতো জেনে কথা বলা। একে সংস্কৃতি-বিষয়ক জ্ঞান বলে।

চমস্কি পারঙ্গমতাবোধের ক্ষেত্রে একই আদর্শ ভাষার দিকটির কথা বলেন। সেখানে বৈশ্বিক ব্যাকরণ প্রাধান্য পায়। সংযোগমূলক পারঙ্গমতাবোধের ক্ষেত্রে ভাষাবৈচিত্র্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

ভাষা ব্যবহার চমস্কি বুঝিয়েছেন, '...the actual use of language in concrete situation' [Chomsky, Aspects of ther Theory of Syntax, page-4]। বক্তার কথা বলা আর শ্রোতার ভাষা-বোধ বা উপলব্ধি করা হল ভাষা ব্যবহার। গতানুগতিকভাবে মনে করা হয় যে, যতটা পারঙ্গমতাবোধ ততটাই ভাষা ব্যবহার করা হয় বা পারঙ্গমতাবোধ যতটা অনুমতি বা ছাড়পত্র দেবে ততটা পর্যন্ত ভাষা ব্যবহার করতে পারব আমরা। বর্তমানে এ ধারণা ভুল তা প্রমাণিত হয়েছে। ভাষা ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা নিয়ে

এর আগে আলোচনা করেছি আমরা। এখানে বলা যায়, ভাষাব্যবহার ব্যাকরণের বিচ্যুতি বা বিভিন্ন বাক্যের বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে। ভাষাব্যবহারের ভুল বা Performance error নানাভাবেই দেখা যায়। যেমন, Black bird-এর অর্থ দুরকম। যদি Black-এ শ্বাসাঘাত দিয়ে উচ্চারণ করা হয় তবে তা এক ধরনের বিশেষ পাখিকে বোঝাবে। যদি দুটি অংশকেই শ্বাসাঘাত পড়ে তবে তা কালো রঙের পাখিকে বোঝাবে। ইংরেজি যাদের মাতৃভাষা নয়, তাদের এই ধারণা নাও থাকতে পারে। তবে তা পারঙ্গমতাবোধের বিষয়। কিন্তু পারঙ্গমতাবোধ থাকা সত্ত্বেও কথা বলার সময় ভুল উচ্চারণ যে-কোনো সময়েই হতে পারে।

আরো নানা ধরনের পারঙ্গমতাবোধের কথা বলেছেন আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীগণ। যেমন, পাঠগত (Textual) পারঙ্গমতাবোধ, বাচনগত (Discourse) পারঙ্গমতাবোধ, বর্ণনা বা আখ্যান নির্মাণের (Narrative) পারঙ্গমতাবোধ, সাহিত্যিক (Literary) পারঙ্গমতাবোধ, ধারণাসম্পর্কিত বা জ্ঞান সম্পর্কিত (Cognitive) পারঙ্গমতাবোধ ইত্যাদি।

৪০৪.৪.১.৪.৪ : ব্যাকরণসম্মত বাক্য—গ্রহণযোগ্য বাক্য

যে বাক্য আমরা সহজেই বুঝতে পারি এবং মনে মনেই তার বিশ্লেষণ করতে পারি তাকেই চমস্কি গ্রহণযোগ্য বাক্য বলে মনে করেন। গ্রহণযোগ্য বাক্য না লিখেই বিশ্লেষণ করা যায়। ব্যাকরণের নিয়ম মেনে যে বাক্য রচিত হয় তাকে ব্যাকরণসম্মত বাক্য বলে। পারঙ্গমতাবোধের সঙ্গে ব্যাকরণসম্মত বাক্যের সম্পর্ক রয়েছে। পারঙ্গমতাবোধ নির্ণয়ের একটি মাপকাঠি হল বাক্যের বা ভাষার ব্যাকরণ মেনে চলা। ব্যাকরণসম্মত বাক্যের সঙ্গে গ্রহণযোগ্য বাক্যের ধারণাকে মেলানো উচিত নয়। গ্রহণযোগ্য বাক্যের একটিমাত্র দিক হল ব্যাকরণ মেনে চলা। কিন্তু এছাড়াও অন্য নানা দিক আছে। ভাষাব্যবহার বোঝার ক্ষেত্রে সহায়ক হল গ্রহণযোগ্যতা।

কোনো বাক্য আদর্শ বা ব্যাকরণের গঠন থেকে বিচ্যুতি হলেও তাকে গ্রহণযোগ্য বাক্য কেন বলব তা নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে পারে। যেমন, খুব তাড়াতাড়ি বললেও বোঝা যাবে এমন বাক্য, মনে রাখা সহজ হচ্ছে এমন বাক্য, স্বাভাবিকভাবে উচ্চারিত হচ্ছে এমন বাক্য ইত্যাদি। সঞ্জননী ব্যাকরণের সূত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে এই ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক বাক্য চমস্কি গ্রহণ করতে চান না। যে বাক্যগুলি খুব সহজেই সঞ্জনিত হয় সেই বাক্যগুলিকেই গ্রহণযোগ্য বাক্য অর্থাৎ সূত্র নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় বাক্য বলে মনে করেছেন। গ্রহণযোগ্য বাক্য হতে গেলে যেমন খুব সহজেই সঞ্জনিত হতে হবে তেমনি খুব সহজেই বোঝা যাবে। স্বাভাবিক ও আয়তনে ছোট বাক্যই তাই ভাষা বিশ্লেষণের পক্ষে গ্রহণযোগ্য বাক্য।

৪০৪.৪.১.৪.৫ : অধোগঠন—অধিগঠন

আন্বয়িক উপাদান শ্রেণি দিয়ে প্রত্যেক বাক্যের ক্ষেত্রে একটি করে অধোগঠন (Deep Structure) ও একটি করে অধিগঠন তৈরি করে। বাক্যের আদর্শ গঠন তৈরি হয় অধোগঠনের মাধ্যমে। অধোগঠনে থাকবে ভিত্তি কক্ষ। সেখানে থাকবে শব্দশেষ আর পদগুচ্ছ সংগঠন সূত্র। আন্বয়িক কক্ষে থাকবে আন্বয়িক সূত্র এবং

সংবর্তন কক্ষে থাকবে সংবর্তন সূত্র। ১৯৫৭-তে শব্দার্থতত্ত্বের কথা চমস্কি বলেননি। ১৯৬৫-র তত্ত্বে তিনি শব্দার্থতত্ত্বের কথা বললেন। অধোগঠনেই বাক্যের অর্থবোধের দিকটি পরিচালিত হবে। অধোগঠন সংবর্তনের মাধ্যমে অধিগঠনে পরিণত হয়। অধিগঠনে বাক্যের ধ্বনিতত্ত্বগত (Phonological) প্রকাশ ঘটে। চমস্কি প্রদত্ত ছকের মাধ্যমে এই দুটি গঠন দেখানো হল—

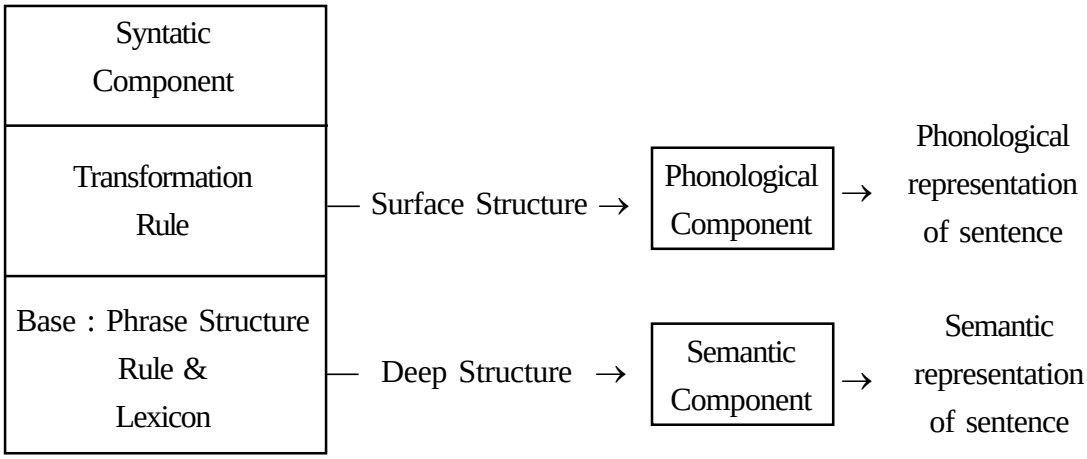

৪০৪.৪.১.৪.৬ : উপাদান শ্রেণি

সঞ্জননী ব্যাকরণের ক্ষেত্রে প্রথমেই প্রথানুসারী ব্যাকরণ অনুসারে যে যে তথ্য লাভ করা যায় তা দেখা যেতে পারে চমস্কি মনে করেছিলেন [1965 : 128]। যেমন, 'Sincerity may frighten the boy' এই বাক্যটি সম্বন্ধে প্রথানুসারী ব্যাকরণে যে তথ্য পাওয়া যাবে তা অনেকটা এই ধরনের—

১. এই শব্দশৃঙ্খলটি একটি বাক্য = Sentence (S), 'frighten the boy' হল ক্রিয়াগুচ্ছ (Verb Phrase) = (VP), এতে ক্রিয়াপদ 'frighten' রয়েছে। ক্রিয়া = Verb (V), বিশেষগুচ্ছ = Noun Phrase (NP) হল 'the boy', 'Sincerity'-ও একটি বিশেষগুচ্ছ। বিশেষগুচ্ছ 'the boy'-তে নির্দেশক = Determiner (Det) হল 'the' ইত্যাদি।

এইসব তথ্য অবশ্যই বাক্যের গঠন বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ। এই বাক্যটির গঠন বিশ্লেষণ করলে তার বৃক্ষচিত্রটি এইরকম দাঁড়ায়—

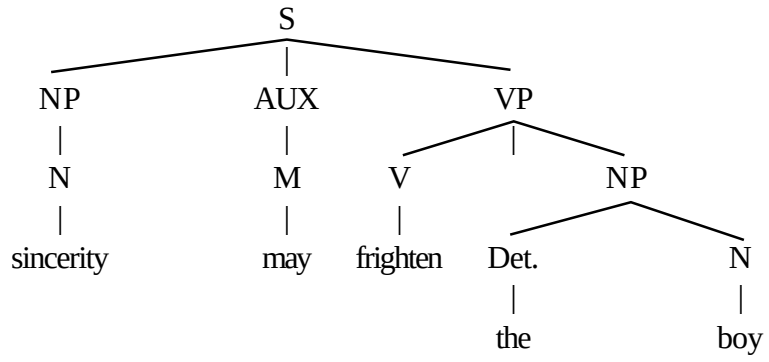

এই ধরনের পদগুচ্ছ বিশ্লেষণী ব্যাকরণে দুটি প্রধান চিহ্ন থাকে—একটি হল শব্দ প্রতীক (formatives) অন্যটি হল—শ্রেণি প্রতীক (Category symbols)। the, boy ইত্যাদি হল শব্দ প্রতীক আর S, NP ইত্যাদি হল—শ্রেণি প্রতীক। পুনর্লিখন সূত্রের মাধ্যমে এই বৃক্ষচিত্রটি এভাবে দেখানো যেতে পারে—

(i) S → NP Aux VP

VP → V NP

NP → Det N

NP → N

Det → the

Aux → M

(ii) M → may

N → sincerity

N → boy

V → frighten

এই সূত্র অনুসারেই বাক্যটি সঞ্জনিত হয়েছ। এই সূত্র ধরে অজস্র বাক্য সঞ্জনিত হতে পারে। S, NP, VP, AUX এই চারটি শ্রেণি হল Major Categories বা প্রধান উপাদান শ্রেণি। আর M, N, V ইত্যাদি হল Lexical Categories বা শব্দ শ্রেণি।

প্রথানুযায়ী ব্যাকরণের উদ্দেশ্য (Subject)—বিধেয় (Prdicate) বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে এই সঙ্গে যুক্ত করা উচিত নয় বলে চমস্কি জানিয়েছেন। Allen এবং Buren জানান—

> "The notion 'Subject', as distinct from the notion 'NP', designates a grammatical function rather than a grammatical category." [Chomsky : Selected Readings, p-45]

বাক্যে ব্যবহার অনুসারে পদভূমিকা অনুসারে উদ্দেশ্য-বিধেয় বিভাজন হয়। এই পদভূমিকার সঙ্গে শ্রেণি প্রতীককে এক করে দেখা সঙ্গত নয়।

৪০৪.৪.১.৪.৭ : ব্যাকরণসম্মত সংবর্তন

অধোগঠন থেকে অধিগঠনে যাওয়ার সময় যে পরিবর্তন ঘটে তাকে বলে সংবর্তন। এই সংবর্তন দুধরনের হতে পারে। (১) একক (singulary) সংবর্তন। একটি পদগুচ্ছ সংগঠনের দ্বারা পরিচালতি হয় যে সংবর্তন তাকে একক সংবর্তন বলে। যেমন,

John kissed Mary → Mary was kissed by John

They will win → Will they win?

The problem was difficult → The problem wasn't difficult.

২. সাধারণীকৃত (generalized) সংবর্তন। একের বেশি পদগুচ্ছ সংগঠন সূত্র দ্বারা পরিচালিত হয়। একটি নতুন পদগুচ্ছ চিত্র নির্মাণ করে। যেমন,

The man stayed for supper
The man bought the house
} The man who bought the house stayed for supper.

He said it
He was going
} He said that he was going.

We have to work hard
It is a nuisance
} Our having to work hard is a nuisance.

চমস্কি প্রদত্ত সংবর্তনগুলি চমস্কি প্রদর্শিত বৃক্ষচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হল—

প্রশ্ন সংবর্তন—

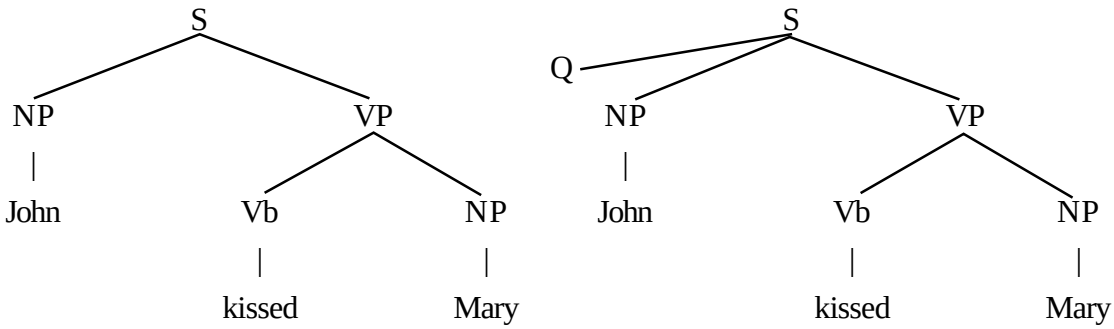

এখানে Q চিহ্ন থাকলে প্রশ্ন সংবর্তটি বাধ্যতামূলক সংবর্তন হবে। যদি Q চিহ্ন না থাকে তাহলে প্রশ্ন সংবর্তন ইচ্ছামূলক সংবর্তন হবে।

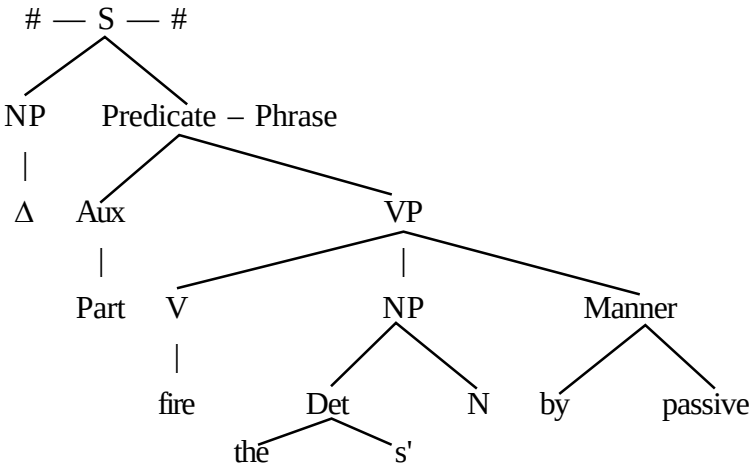

এই বৃক্ষচিত্রে s´ চিহ্ন থাকায় এর সঙ্গে আর একটি বৃক্ষচিত্র যুক্ত হবে।

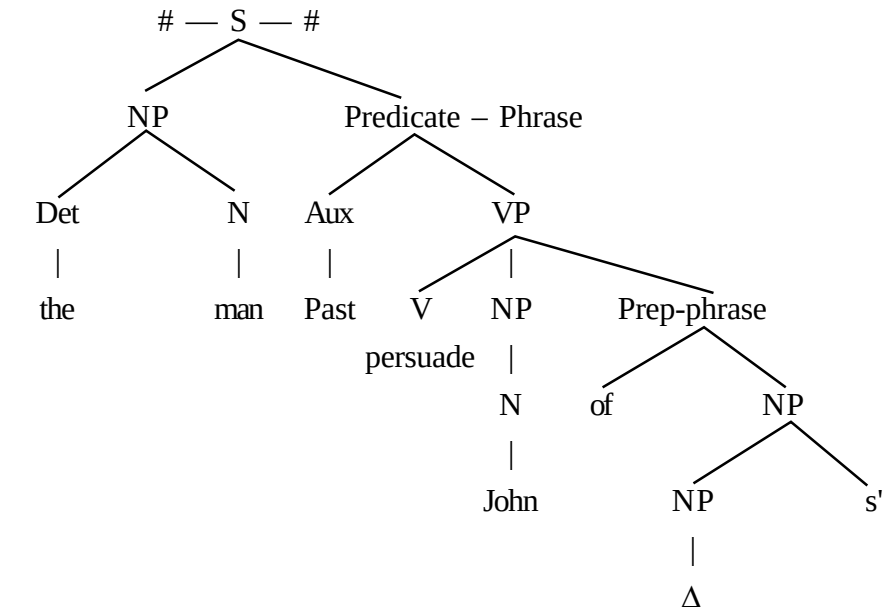

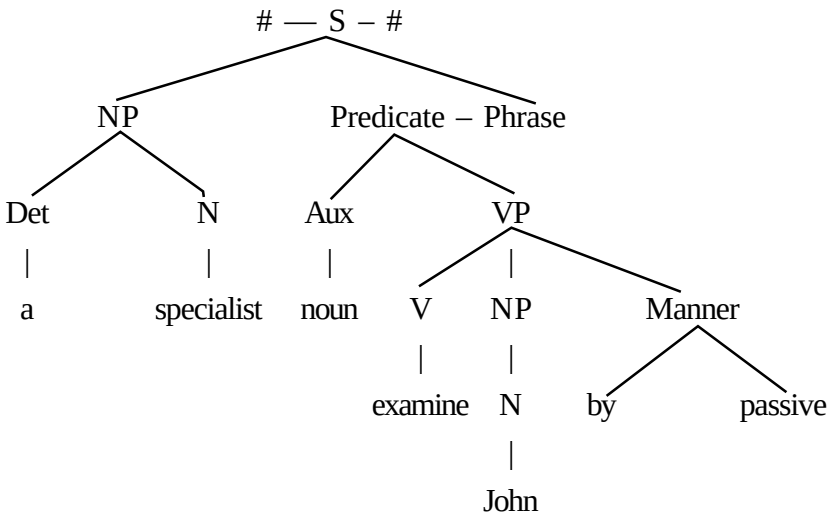

the man who persuaded John to be examined by a specialist was fired—এই বাক্যটি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই তিনটি বৃক্ষচিত্র প্রয়োজন।

চমস্কি জানালেন,

"Thus the syntactic component consists of a base that generates deep structures and a transformational part that maps them into surface structures."

এভাবে আন্বয়িক কক্ষ থেকে অধোগঠন তৈরি হয়। সংবর্তন কক্ষ তাকে অধিগঠনে পরিণত করে।

বাক্যের অধোগঠন শব্দার্থতত্ত্ব কক্ষের মাধ্যমে অর্থবোধ ঘটায়। সঞ্জননী ব্যাকরণের কাজ হল শব্দার্থতত্ত্বের ব্যাখ্যার সঙ্গে ধ্বনিতত্ত্বের প্রকাশকে মিলিয়ে দেওয়া।

> "The final effect of a grammar, then, is to relate a semantic interpretation to a phonetic representation—that is, to state how a sentence is interpreted."—Chomsky 'Aspect of the theory of Syntax'.

৪০৪.৪.১.৫ : বাংলা ভাষার সংবর্তন

বৈদিক ব্যাকরণের সূত্র অনুসরণ করেই নোয়াম চমস্কি বাক্য বিশ্লেষণের যে সূত্র নির্মাণ করেছেন তার বিন্যাস বিশেষ ব্যাকরণের। কারণ, তিনি ইংরেজি বাক্যের গঠন বিশ্লেষণ করার প্রসঙ্গ ধরেই অধোগঠন এবং অধিগঠনের বৃক্ষচিত্র এবং পদগুচ্ছ সংগঠন সূত্র (Phrase Structure Rule) তৈরি করেছেন। বাংলা বাক্যের ক্ষেত্রে বৃক্ষচিত্রর বিন্যাস পদগুচ্ছ সংগঠন সূত্র হুবহু চমস্কি যেভাবে দেখিয়েছেন সেভাবে হবে না। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা বর্তমান লেখকের 'বাংলা পদগুচ্ছের সংগঠন' গ্রন্থে পাওয়া যাবে। এখানে সংক্ষেপে বাংলা ভাষায় বৃক্ষচিত্র ও পদগুচ্ছ সংগঠন সূত্র দেওয়া হল।

বাক্য → বিশেষ্যগুচ্ছ + ক্রিয়াগুচ্ছ [বি. গুচ্ছ + ক্রি. গুচ্ছ]

বি. গুচ্ছ → নির্দেশক + বিশেষণ + বিশেষ্য [নি. + বিণ. + বি.]

ক্রি. গুচ্ছ → বি. গুচ্ছ + ক্রিয়া + সহায়ক

সহায়ক → বিভক্তি [কালবিভক্তি, ভাব বিভক্তি, প্রকার বিভক্তি], নঞর্থক, প্রশ্নবোধক

বি. → বই, গাছ, আমি...

বিণ. → ভালো, খারাপ, দামী...

ক্রি. → যা, খা, বল্, শুন্...

নি. → ঐ, এই, কই...

ইংরেজি ভাষায় সহায়কের গুরুত্ব বেশি। তাই সহায়ক প্রধান উপাদান শ্রেণি হিসেবে বিবেচিত। বাংলা ভাষায় সহায়ক তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। সেকারণে সহায়ককে প্রধান উপাদান শ্রেণি হিসেবে দেখা হয় না। ক্রিয়াগুচ্ছর অন্তর্গত একটি শ্রেণি হিসেবে দেখা হয়। ইংরেজি বাক্যের বিন্যাসক্রম হল—'কর্তা-ক্রিয়া-কর্ম' = [SVO], কিন্তু বাংলা বাক্যের প্যাটার্ন - [SVO] বা কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া গঠন। তাই ইংরেজি ভাষার বৃক্ষচিত্রে যেমন কর্মকে বাক্যের শেষে রাখা হয়েছে বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে তেমনটা করা চলে না। তাই বিন্যাসক্রম ইংরেজির মতো না হয়ে বাংলা ভাষার নিজস্ব রীতি অনুযায়ী হবে। কয়েকটি বাক্য বৃক্ষচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হল—

১. এই সাদা গরুটি ঐ সবুজ মাঠে চরেছিল।

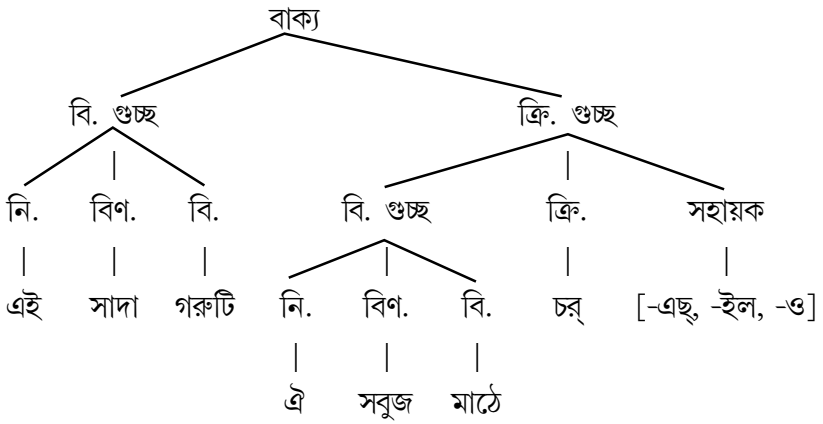

২. তুমি বাড়ি যাবে কি?

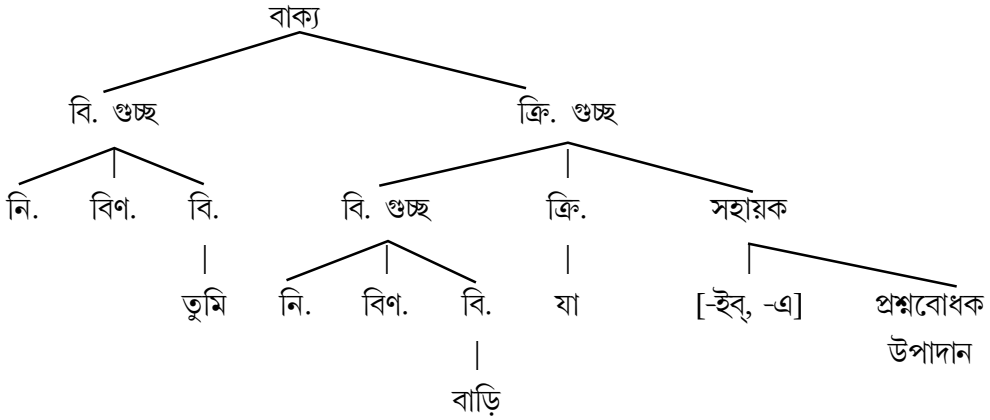

৩. এই ভিজে বিড়ালটি কাল মাছ খায়নি।

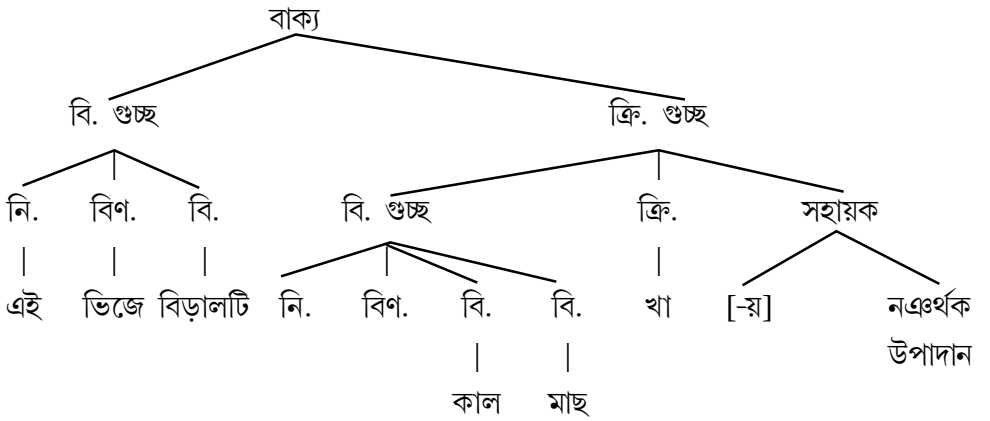

৪. ঐ সবুজ ঘাসে ঢাকা মেঘে-ছাওয়া দিগন্ত-বিস্তৃত মেয়েটি গতকাল এসেছিল।

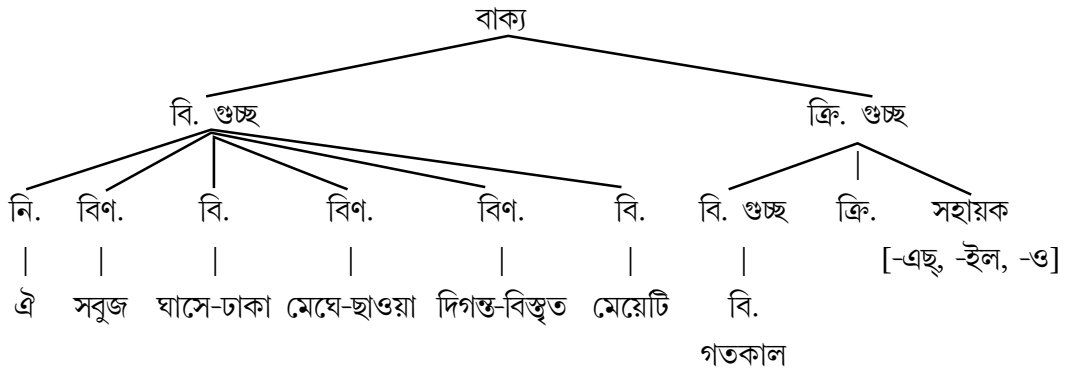

প্রথম তিনটি বাক্য স্বাভাবিক। চতুর্থ বাক্যটির বক্তব্যে রয়েছে অর্থগত বিসঙ্গতি। যদিও কবিতার ভাষায় এধরনের বিশেষণ ব্যবহৃত হতে পারে। 'মেয়েটি'-র বিশেষণ হিসেবে যে পদগুলি ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলির অর্থগত বিপর্যাস একটি প্রতীক অর্থ ব্যঞ্জিত করে। ভাষার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এবং সূত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে এ ধরনের বাক্য গ্রহণযোগ্য বাক্য নয়। প্রথম বাক্যটি সাধারণ বিবৃতিমূলক বাক্য। দ্বিতীয়টি প্রশ্নবোধক বাক্য এবং তৃতীয়টি হল নঞর্থক বাক্য। নিজের উদাহরণগুলিতে গঠন অনুসারে ভিন্ন ধরনের বাক্য বৃক্ষচিত্রে দেখানো হল।

ক. মৌলিক (= সরল) বাক্য (mono-clause structure)। এই বাক্য একটিমাত্র বাক্যখণ্ড দিয়ে গঠিত।

১. আমি বাড়ি যাব।

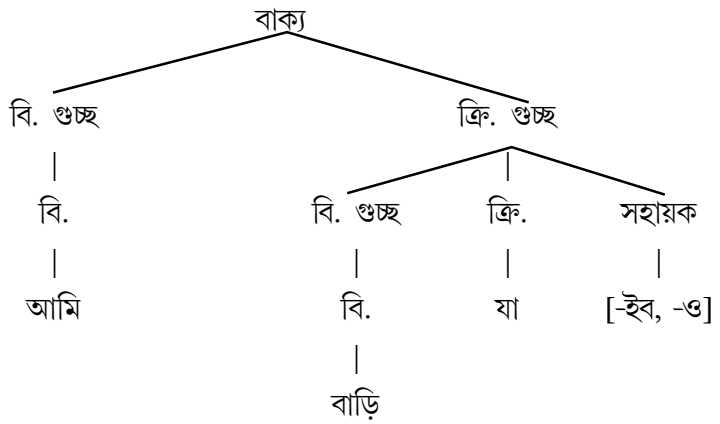

২. আমি পড়তে বসব।

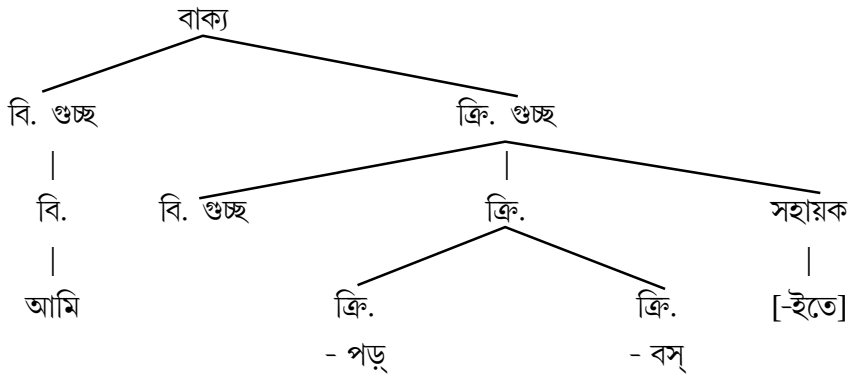

খ. অমৌলিক বাক্য। সংযোগমূলক বাক্য (Co-ordinating structure)

৩. আমি বাড়ি যাব এবং আমি চাউ খাব।

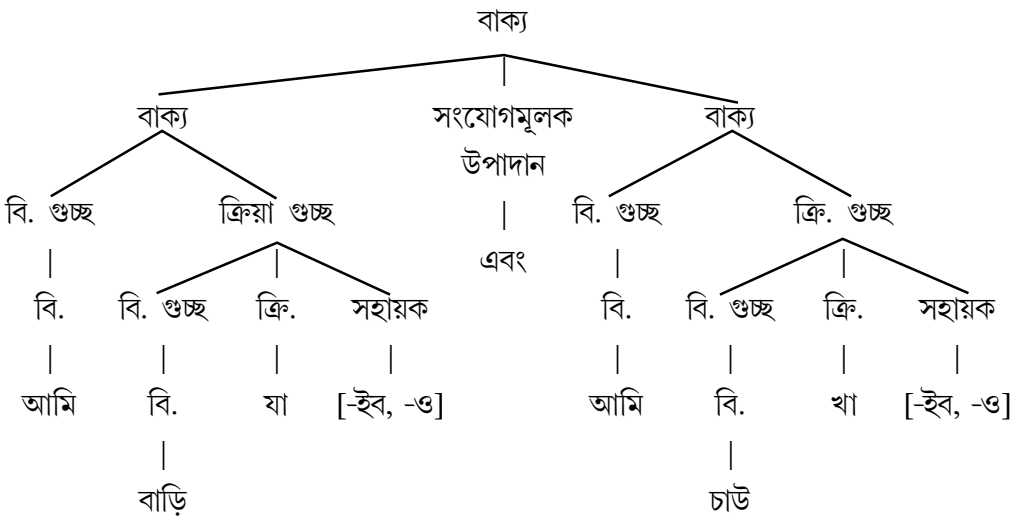

৪. আমি তাকে ডেকেছি আর সে-ও এসেছে।

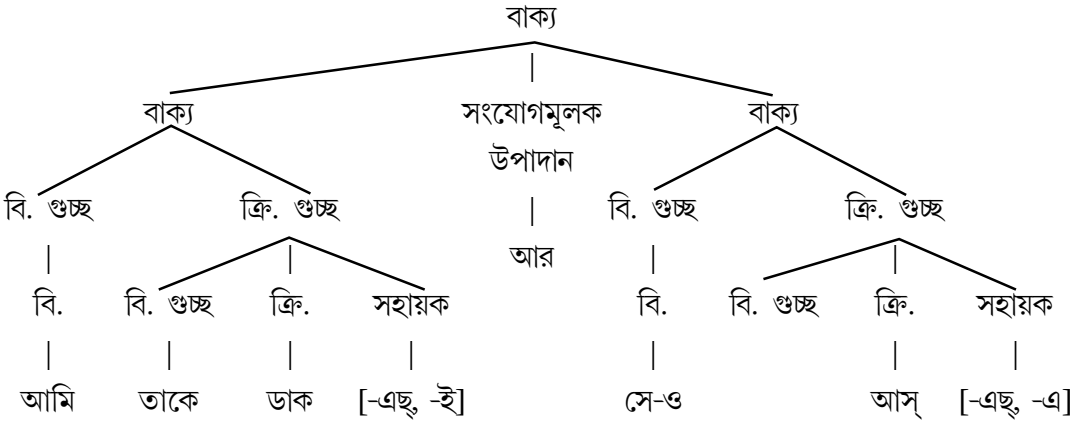

গ. অ-মৌলিক বাক্য। আশ্রয়মূলক বাক্য (Sub-ordinating structure)।

৫. আমি বাড়ি গিয়ে চাউ খাব।

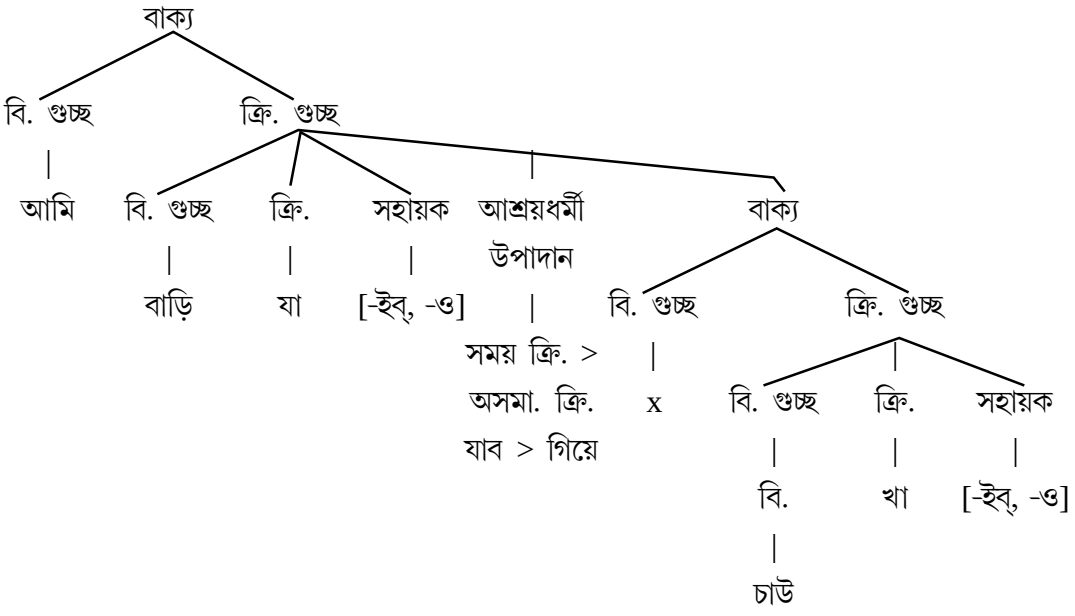

৪০৪.৪.১.৬ : বাক্য সংবর্তন

পরিণাম অনুসারে সংবর্তন চার ধরনের। কোনো উপাদান বাড়তি যোগ হলে বলা হয় সংযোজন (Addition)। কিছু বাদ গেলে বলা হয় বিলোপন (Delection)। একটি উপাদানের বদলে অন্য উপাদান ব্যবহৃত হলে হয় রূপান্তরণ বা বি-স্থাপন (Substitution)। দুটি উপাদানের পারস্পরিক অবস্থান বদলালে হল বিপর্যাস (Extraposition)। যখন আমরা কথা বলি তখন এ ধরনের অজস্র সংবর্তন ঘটতে থাকে। একটি বাক্য অধোগঠন থেকে অধিগঠনে রূপান্তরিত হবার সময় এক বা একাধিক সংবর্তন হতে পারে। যত ধরনের সংবর্তন হোক না কেন সব ধরনের সংবর্তনকে এই চার শ্রেণির অন্তর্গত করা হয়।

সংবর্তনে নানা ধরনের নাম দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন—প্রশ্ন সংবর্তন, নঞ্ সংবর্তন, বিগর্ভন, বিশেষ্যীভবন, সংযোজন, স্থিতি ক্রিয়া বিলোপন ইত্যাদি। এগুলি সবই পরিণাম অনুসারে যে-কোনো একটি বা একের বেশি সংবর্তনের এলাকায় থাকবে। প্রথমে পরিণাম অনুসারে চার ধরনের সংবর্তন আলোচনা করব। পরে বিশেষ ধরনের কিছু সংবর্তন দেখানো হবে।

ক. সংযোজন (Addition) :

বাক্যে বাড়তি উপাদান যুক্ত করাকে সংযোজন বলে। কোনো কিছু বক্তব্য জোর দিতে গেলে নিশ্চয়ার্থক-ই ব্যবহৃত হয়। যথা—'আমি যাব' বনাম 'আমি যাবই' বা 'আমিই যাব'। 'আমি যাব'। 'আমি যাব' সাধারণ বিবৃতি। নিশ্চয়ার্থক 'ই' যোগ করে বক্তব্যের বিশেষ রূপ তৈরি করা হয়েছে। অধোগঠন থেকে সংবর্তনের মাধ্যমে কীভাবে অধিগঠন তৈরি হচ্ছে তা বৃক্ষচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হল—

১. আমি যাব > আমিই যাব।

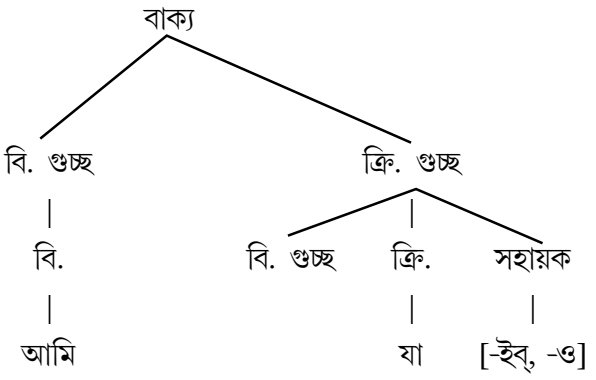

নিশ্চয়ার্থক যোগ ——————↑

অধিগঠন → আমিই যাব।

২. আমি যাব > আমি যাবই

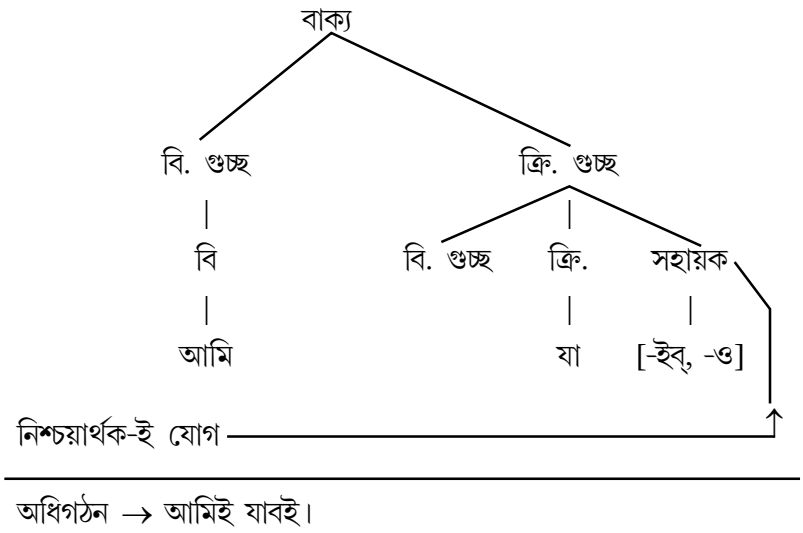

অধিগঠন → আমিই যাবই।

৩. তুমি এসেছো > তুমিই এসেছো

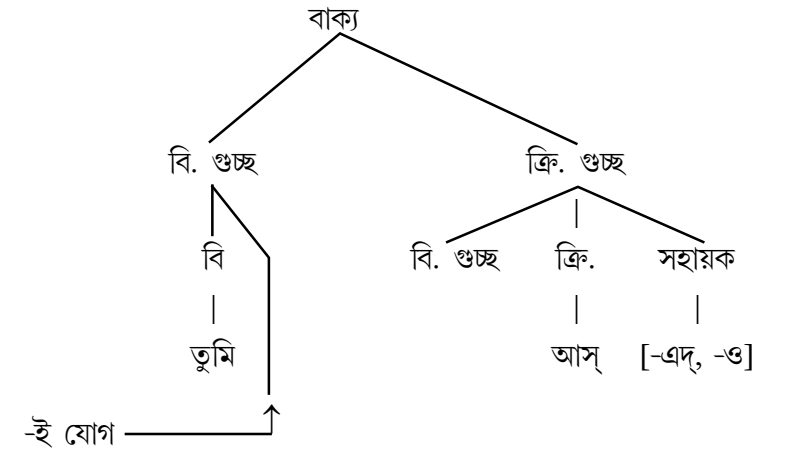

অধিগঠন → তুমিই এসেছো!

৪. তুমি বাড়ি থাকবে > তুমি বাড়িতেই থাকবে

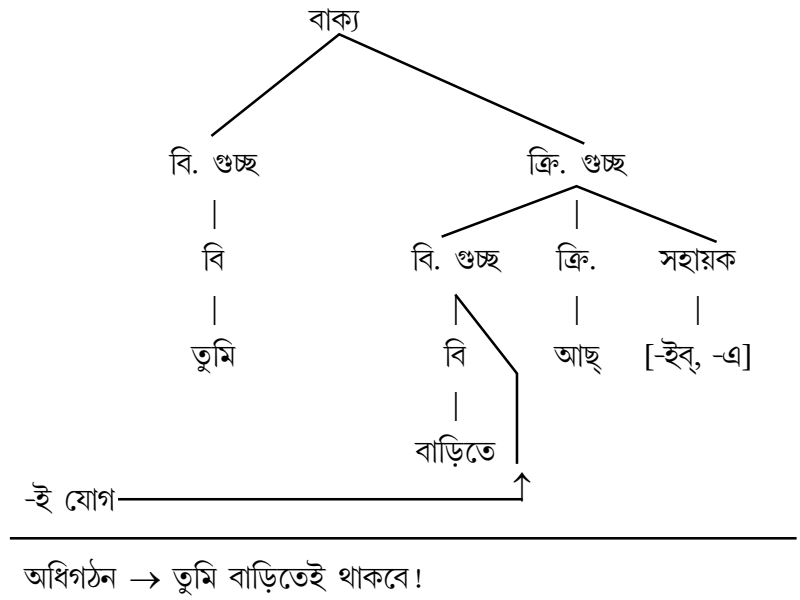

অধিগঠন → তুমি বাড়িতেই থাকবে!

এই ধরনের সংযোজনকে '-ই সংযোজন' বলে। আবার 'যে সংযোজন' -ও বাংলা ভাষায় পাওয়া যায় যেমন, (দ্রুত লেখার জন্য ইংরেজি পরিভাষা ব্যবহার করা যেতে পারে।)

৫. তুমি বললে > তুমি বললে যে

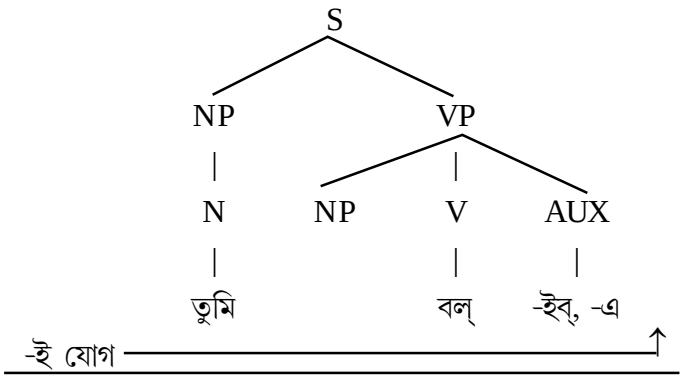

তুমি বললে যে

৬. তুমি বললে > তুমি যে বললে

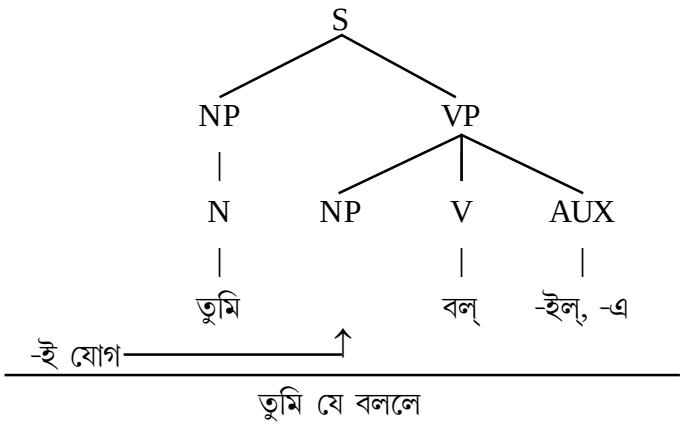

একের বেশি বাক্যকে জুড়ে একটি বড় বাক্য তৈরি করাও বাক্য সংযোজন। সংযোগধর্মী উপাদান বা আশ্রয়ধর্মী উপাদান এখানে যুক্ত করা হয়। এই ধরনের বাক্যের গঠনে একটি বাক্যের মধ্যে একের বেশি বাক্য যুক্ত হয়। যেমন—

বাক্য ১ - আমি বাড়ি যাব।

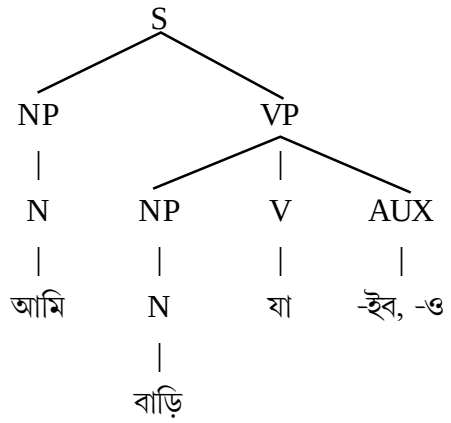

বাক্য ২ - রহিম এখানে থাকবে।

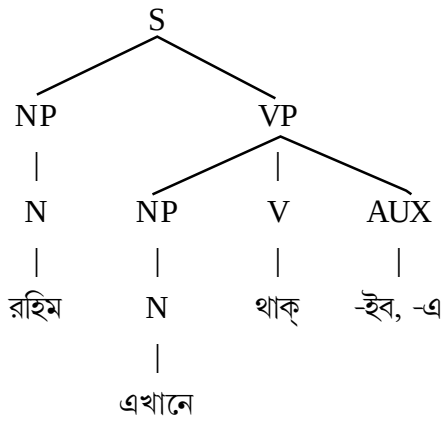

এই দুটি বাক্যের ক্ষেত্রে যেমন সংযোগমূলক উপাদান যোগ করে সংযোগধর্মী বাক্যে পরিণত করা যায় তেমনি আশ্রয়মূলক উপাদান যোগ করে আশ্রয়ধর্মী বাক্য হিসেবেও সংবর্তিত করা সম্ভব। এখানে এক এক করে এই দুধরনের সংযোজন দেখানো হল—

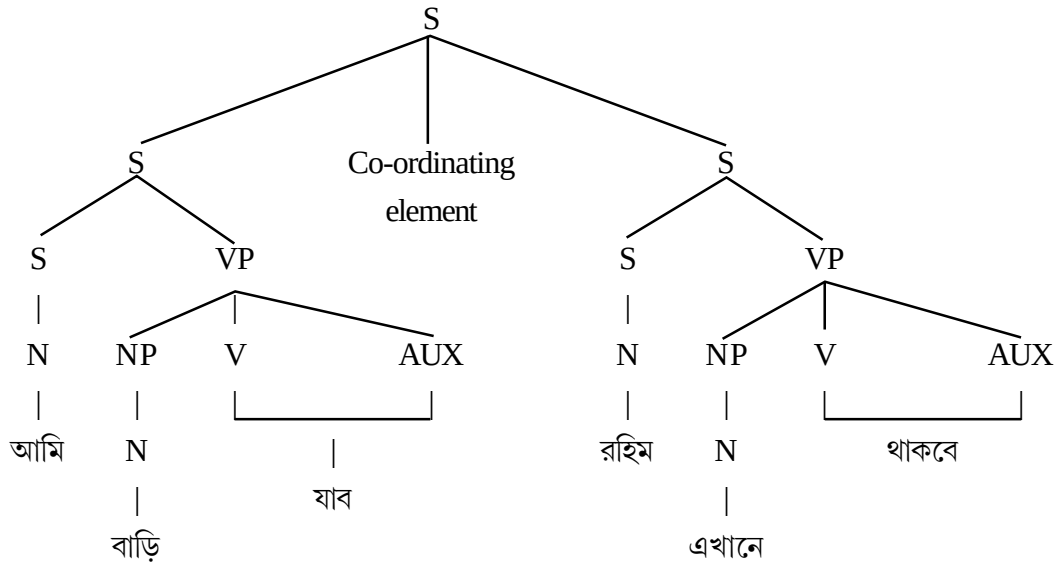

এখানে সংযোগধর্মী উপাদান ‘আর’ যুক্ত হয়েছে। এছাড়াও দুটি বাক্য পরস্পর সংযুক্ত হয়েছে। এই একই বাক্য দুটি আশ্রয়মূলক বাক্য হিসেবে কীভাবে সংযোজিত হতে পারে তা দেখানো হল।

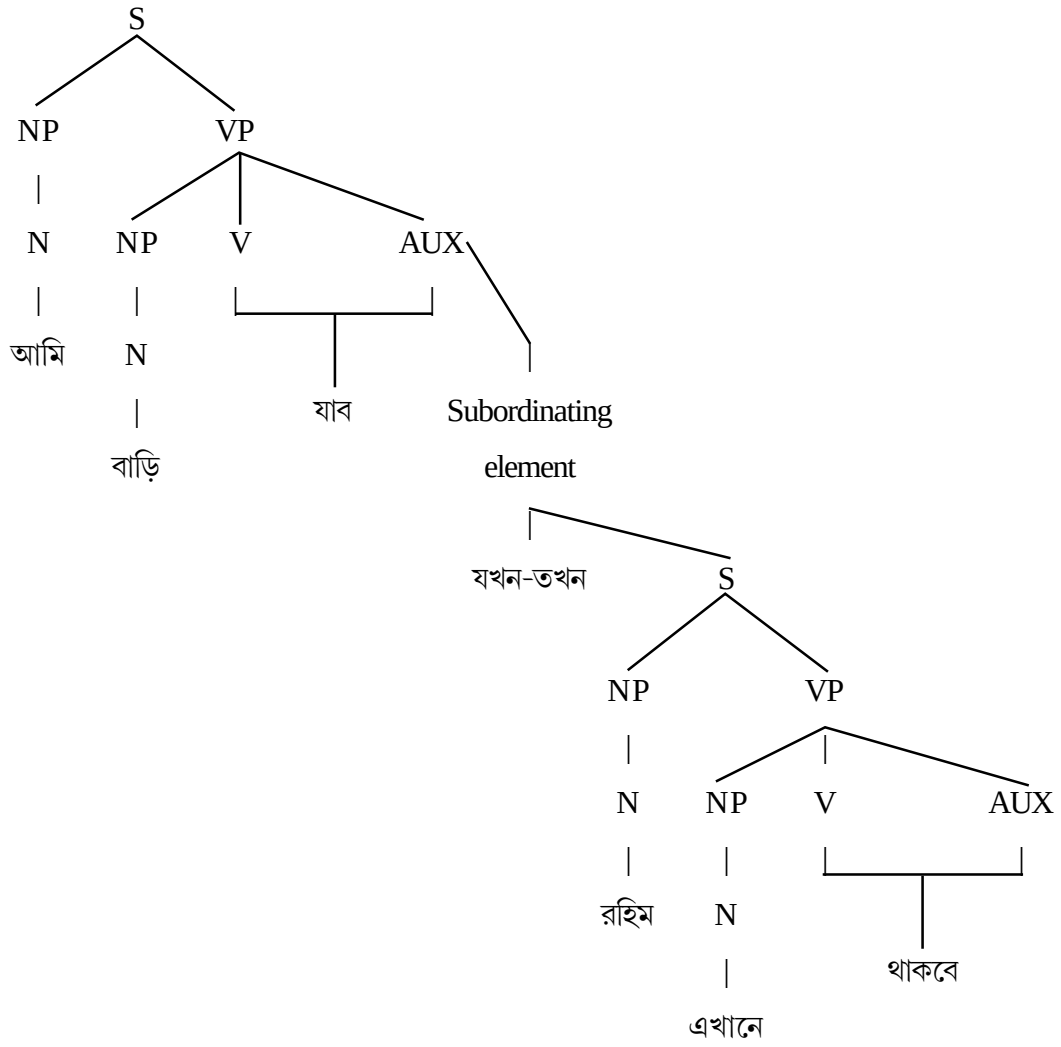

সংযোজিত আশ্রয়মূলক বাক্য—যখন আমি বাড়ি যাব তখন রহিম এখানে থাকবে ‘যদি-তবে’ দিয়েও এই বাক্য গঠিত হতে পারে। তখন ‘যাব’ ক্রিয়াপদটি ‘যাই’ রূপে ব্যবহৃত হবে। ‘যদি আমি বাড়ি যাই তবে রহিম এখানে থাকবে।’ এই ধরনের সংযোজনের উদাহরণ আরও একটি দেওয়া হল।

বাক্য-১ সে আমাকে বলেছিল।

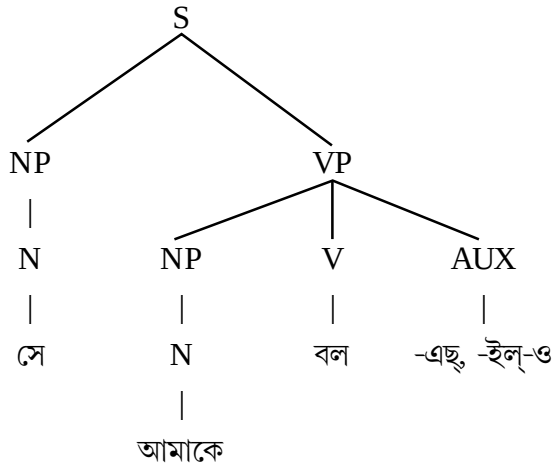

বাক্য-২ তারা আমাকে মারবে।

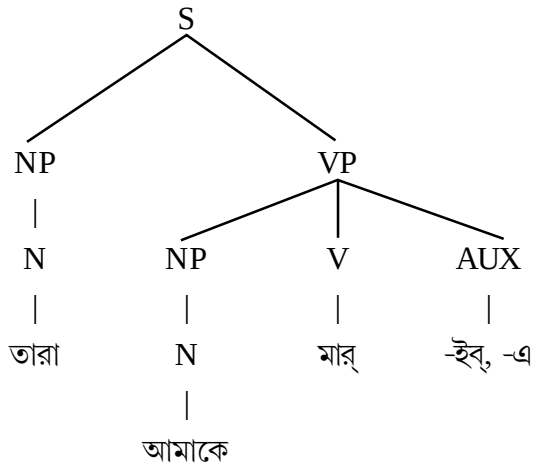

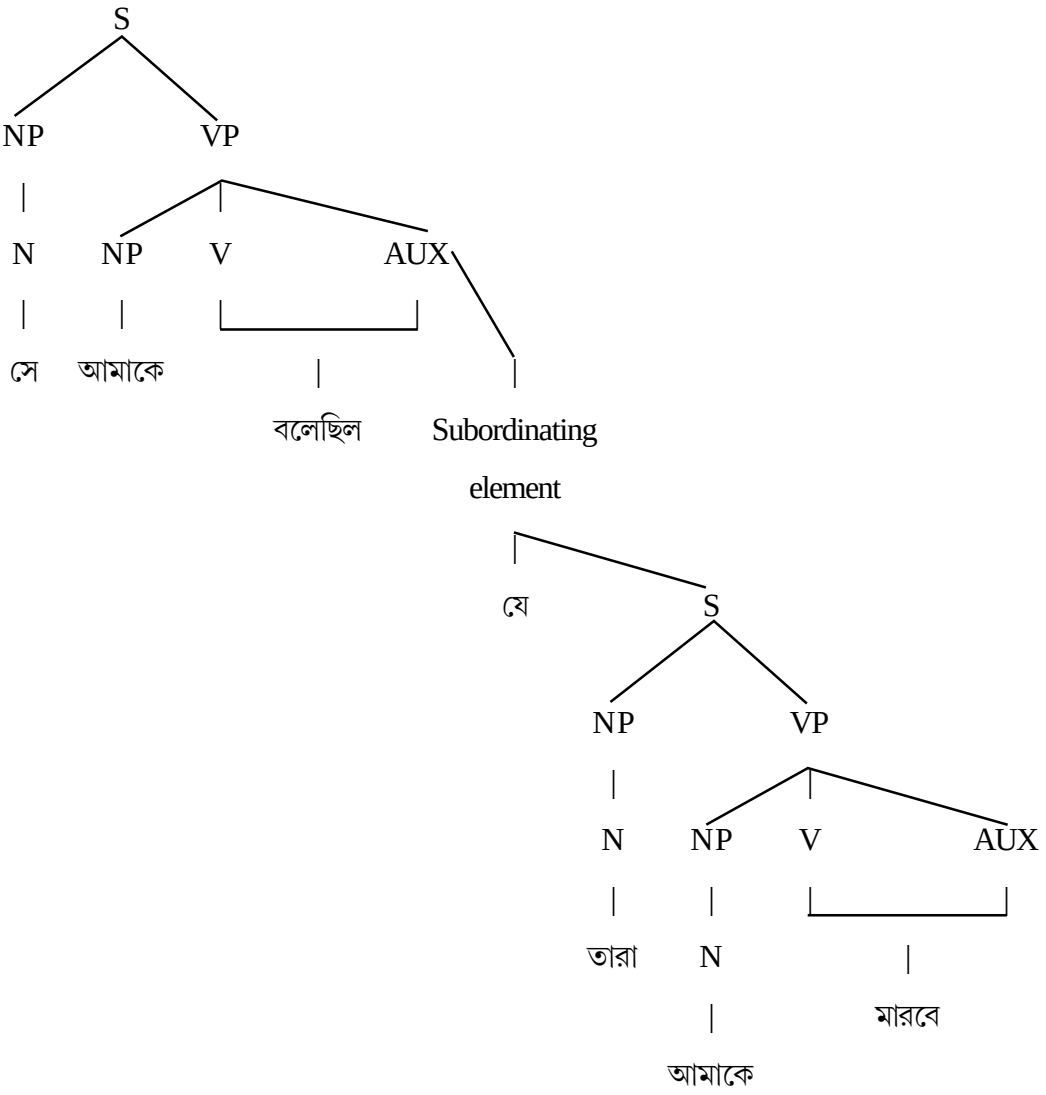

সে আমাকে বলেছিল যে, তারা আমাকে মারবে।

একটি বাক্যের অভ্যন্তরে বা ভিতরে আর একটি বাক্য যুক্ত করাও এক ধরনের বাক্য সংযোজন। একটি বাক্যের অভ্যন্তরে অন্য একটি সাধারণ বাক্য বা বিশেষ্যীভূত (Nominalized) বাক্যকে নিয়ে আসাকে বাক্য বিগর্ভণ (Sentence Embedding) বলে। যেমন,

১. আমি বইটা তাকে দিলাম।

২. বইটা গতকাল কিনেছিলাম।

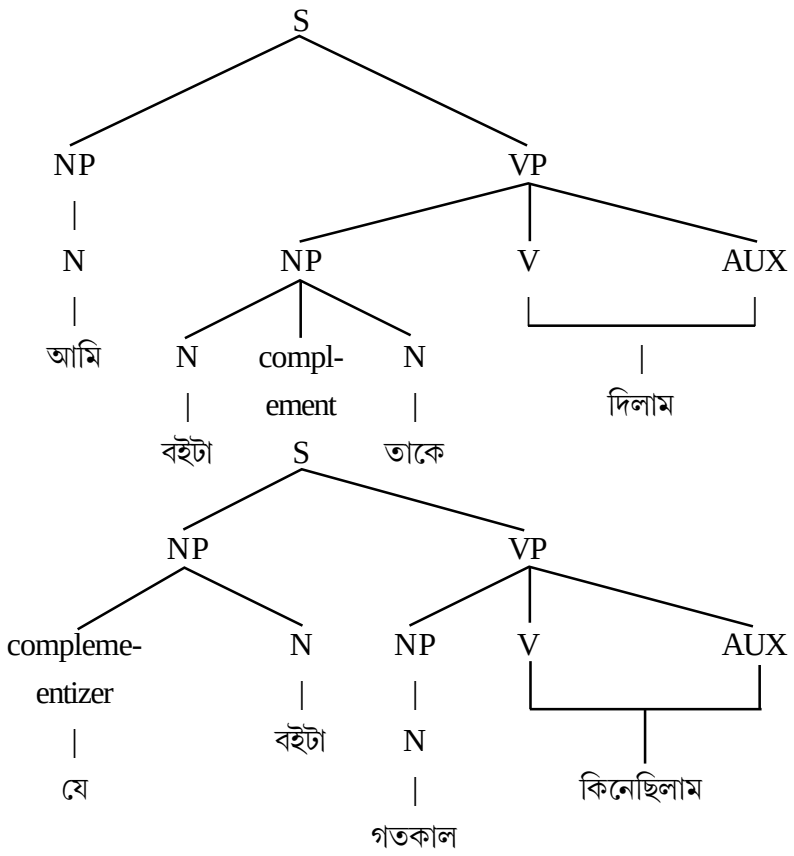
S
NP
VP
N
NP
V
AUX
আমি
N
compl-
N
দিলাম
বইটা
ement
তাকে
S
NP
VP
compleme-
N
NP
V
AUX
entizer
বইটা
যে
N
কিনেছিলাম
গতকাল

১. সে গান গাইছিল।

২. আমি গান শুনছিলাম।

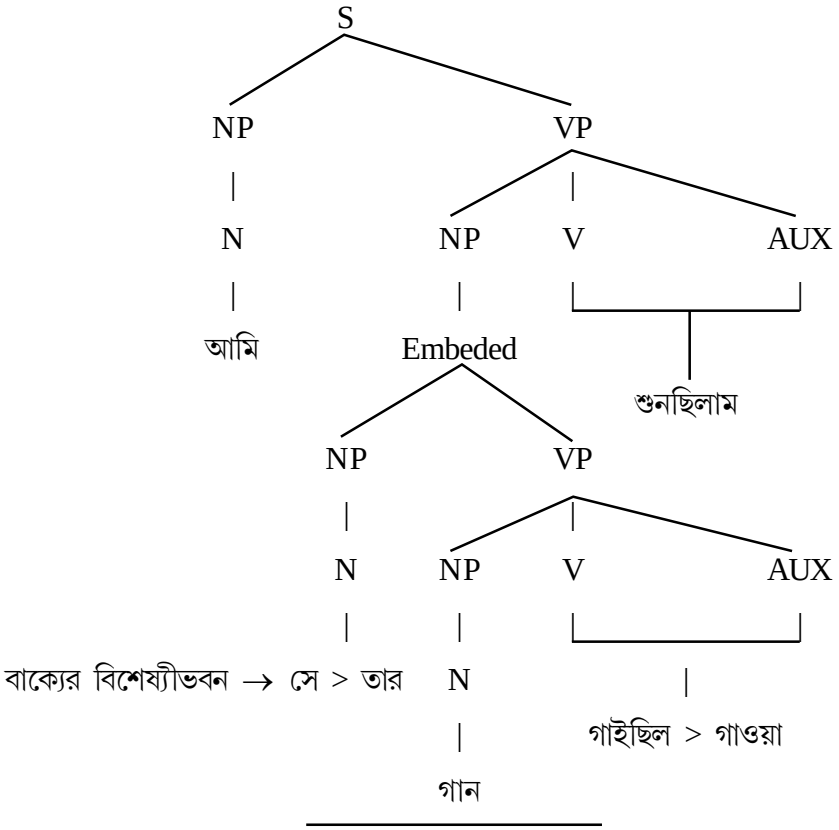

তার গান গাওয়া

বাক্য বিগর্ভণের কালে প্রাপ্ত বাক্য - আমি তার গান গাওয়া শুনছিলাম

একটি বাক্যকে বিশেষ্যপদে পরিণত করাকে বিশেষ্যীভবন (Nominalization) বলে। ক্রিয়াপদটি এইসব বাক্যে ক্রিয়াবিশেষ্য পদে পরিণত হয়। ফলে, পুরো বাক্যটিই বিশেষ্য পদে পরিণত হয়। এই ধরনের বিশেষ্যীভূত (Nominalized) বাক্যকে অন্য একটি বাক্যের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। একটি বাক্যের ভিতরে বিশেষ্যীভূত বাক্য যোগ করাকেও বাক্যবিগর্ভণ বলে।

খ. বিলোপন

যখন বাক্যের কোনও একটি উপাদান লোপ পায় তখন বিলোপন জাতীয় সংবর্তন ঘটে। নানা ধরনের বিলোপন হতে পারে। এখানে দু-একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

স্থিতিক্রিয়া বিলোপন।

কোনও কিছু আছে বা অবস্থান করছে বোঝাতে ব্যবহৃত হয় স্থিতিক্রিয়া (Existencial Verb)। অধিকাংশ সময়েই আমাদের কথাবার্তায় এই ক্রিয়াপদকে বাদ দিই। 'ওখানে একটা গাছ আছে' না বলে বলি 'ওখানে একটা গাছ'। 'সামনে গর্ত রয়েছে' না বলে বলি 'সামনে গর্ত ইত্যাদি। এখানে দুটি উদাহরণ দিয়ে কীভাবে স্থিতিক্রিয়া বিলোপিত হচ্ছে তা দেখানো হল।

বাক্য- তোমার সামনে গর্ত।

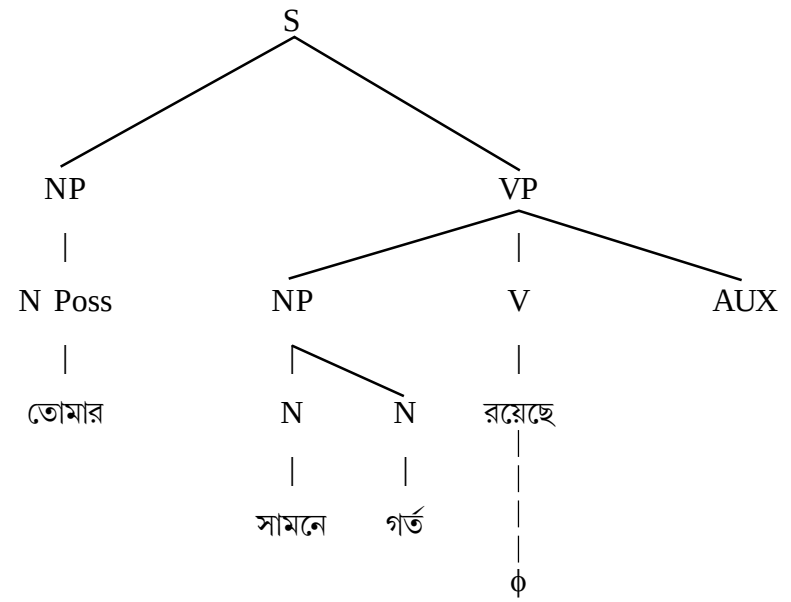

স্থিতিক্রিয়া বিলোপন

অধিগঠন : তোমার সামনে গর্ত

স্থিতিক্রিয়া বিলোপন এবং কর্তা বিলোপন।

বাক্য- সামনে বাস।

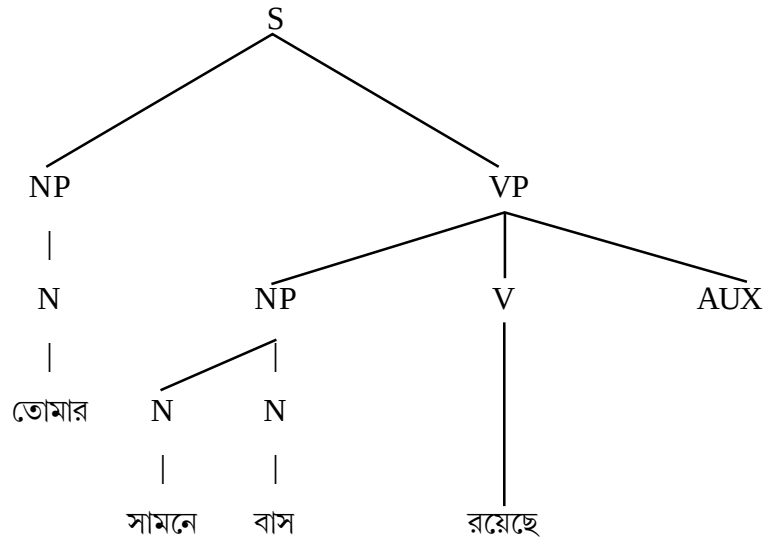

স্থিতিক্রিয়া বিলোপন- ϕ

কর্তা বিলোপন- ϕ

অধিগঠন : তোমার সামনে বাস

এখানে স্থিতিক্রিয়া বিলোপন ছাড়াও আরও একটি বিলোপন দেখানো হয়েছে। সেটি হল—বাক্যের কর্তা অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে না। তখন বাক্য বিষয়কে গুরুত্ব দেবার জন্যই কর্তার বিলোপন ঘটানো হয়। এই বিলোপনকে 'কর্তা বিলোপন' (Subject Deletion) বলে।

গ. অধোগঠনে বাক্যের বা আদর্শ বাক্যের দুটি উপাদান পদের পারস্পরিক অবস্থান পরিবর্তন করলে অর্থাৎ একটি উপাদানের জায়গায় অন্য উপাদান ও অন্য উপাদানের জায়গায় বদলি উপাদানটি বসলে বিপর্যাস সংবর্তন ঘটে। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে 'ক্রিয়া বিশেষণ পরস্থাপন' এই ধরনের বিপর্যাস সংবর্তন। এখানে উদাহরণ দিয়ে বিপর্যাস সংবর্তন দেখানো হল।

ক্রিয়া বিশেষণ পরস্থাপন

আমি দেখব না।

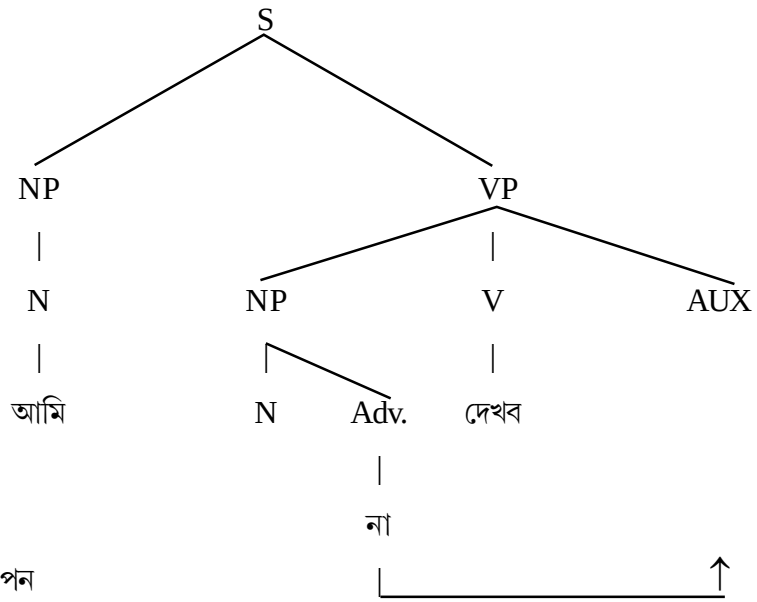

না দেখব > দেখব না

অসমাপিকা ক্রিয়ার আগে ক্রিয়া বিশেষণ হিসেবে 'না' থাকলে সেক্ষেত্রে 'ক্রিয়া বিশেষণ পরস্থাপন' সংবর্তন হয় না। যেমন, 'সে না দেখে বলেছে', 'আমি না জেনে বলব না' অর্থাৎ সমাপিকা ক্রিয়ার ক্ষেত্রেই কেবল ক্রিয়া বিশেষণ পরস্থাপন ঘটে।

তিনি আসবেন না।

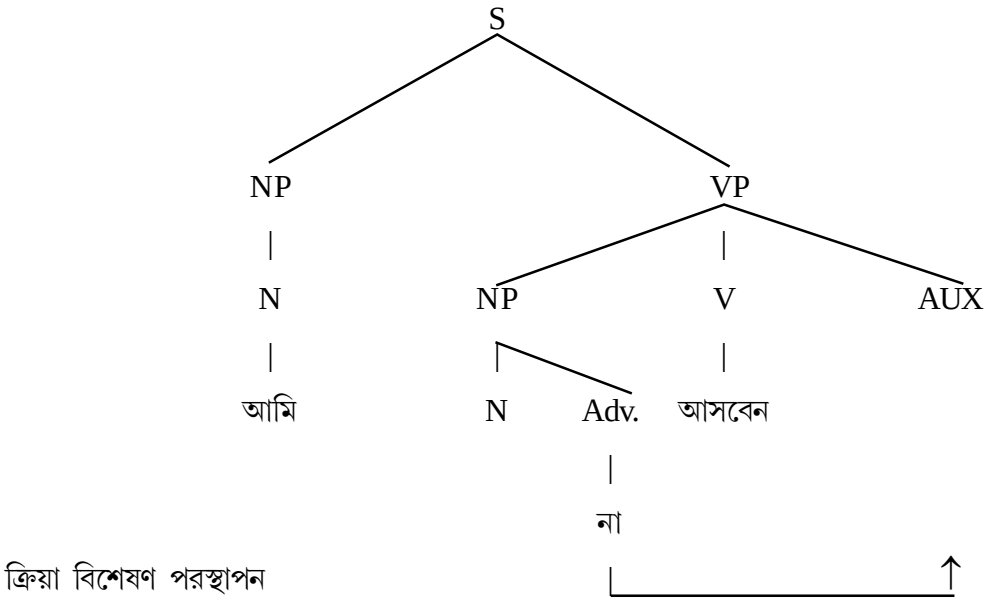

তিনি না আসবেন > তিনি আসবেন না

ঘ. রূপান্তরণ

একটি উপাদানের পরিবর্তে অন্য উপাদান ব্যবহার করাই হল—রূপান্তরণ (Substitution)। 'কলম' না বলে যদি 'পেন' বলি তাহলে তা হল রূপান্তরণ। অনেক সময় পরিভাষা ব্যবহার করলে যদি কেউ বুঝতে না পারে তখন সেটা ঘুরিয়ে ব্যাখ্যা করে বা অন্যভাবে বলা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রেও রূপান্তরণ জাতীয় সংবর্তন হয়। বাংলা ভাষায় নানা ধরনের রূপান্তরণ সংবর্তন হয়। যেমন—ক্রিয়াপদ যদি ক্রিয়াবিশেষ্য পদে পরিণত হয় তবে তা এক ধরনের রূপান্তরণ। যেমন, সে খেল > তার খাওয়া। এখানে 'খেল' ক্রিয়াপদ এবং 'খাওয়া' ক্রিয়াবিশেষ্য পদ। নামপদকে সর্বনামপদে রূপান্তরণ খুব গুরুত্বপূর্ণ সংবর্তন। এখানে সেই ধরনের সংবর্তন দেখানো হল।

তিনি বাড়ি গেলেন।

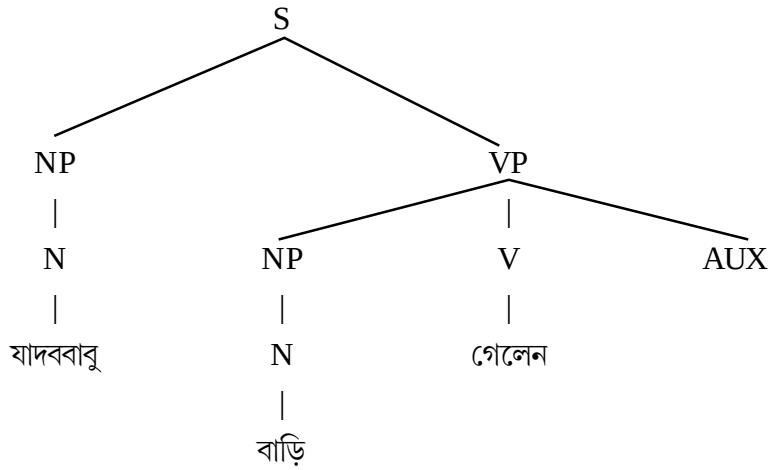

সর্বনামীভবন → তিনি

তিনি বাড়ি গেলেন

জামাল সেখানে গেল।

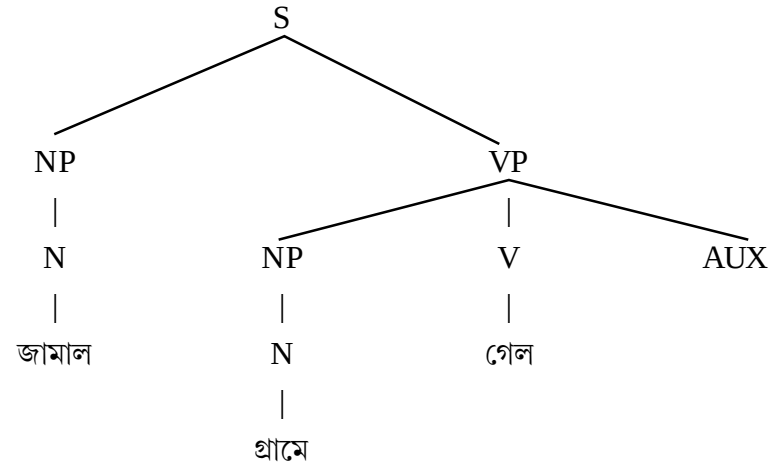

সর্বনামীভবন → সেখানে

জামাল সেখানে গেল

সে ওখানে ছিল।

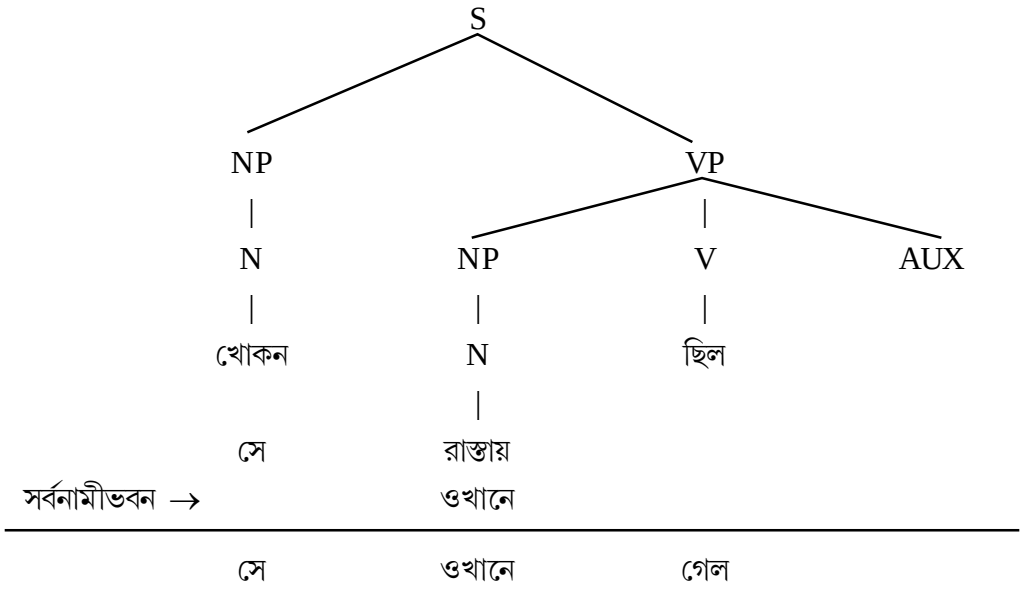

সর্বনামীভবনের ক্ষেত্রে মূল বিশেষ্যপদটি বক্তা-শ্রোতা উভয়ের কাছেই পূর্বপরিচিত থাকে।

৪০৪.৪.১.৭ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। অব্যবহিত উপাদান কাকে বলে? উদাহরণ দিয়ে অব্যবহিত উপাদান গঠন-এর বিস্তারিত আলোচনা করো।

২। কীভাবে নোয়াম চমস্কি সঞ্জননী ভাষাবিজ্ঞানের ধারণা আমাদের কাছে উপস্থাপন করলেন তা আলোচনা করো।

৩। সঞ্জননী ব্যাকরণের প্রধান সূত্রগুলি লেখো।

৪। পারঙ্গমতাবোধ ও ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখো।

৫। উপাদানশ্রেণি বলতে চমস্কি কী বুঝিয়েছেন তা সংক্ষেপে আলোচনা করো।

৬। ব্যাকরণসম্মত সংবর্তন নিয়ে একটি নিবন্ধ রচনা করো।

৭। সংক্ষেপে আলোচনা করো—

(ক) ভাষার একক (খ) সংবর্তনী-সঞ্জননী ব্যাকরণ (গ) বৈদ্ধিক ব্যাকরণ (ঘ) পারঙ্গমতাবোধ (ঙ) ব্যাকরণসম্মত বাক্য - গ্রহণযোগ্য বাক্য (চ) অধোগঠন - অধিগঠন (ছ) উপাদান শ্রেণি (জ) পদগুচ্ছ সংগঠন সূত্র (ঝ) একক সংবর্তন (ঞ) সাধারণীকৃত সংবর্তন (ট) বৃক্ষচিত্র।

৮। বাংলা ভাষার পদগুচ্ছ সংগঠন নিয়ে আলোচনা করো।

৯। বাংলা মৌলিক ও অমৌলিক বাক্যের গঠন সম্পর্কে লেখো।

১০। সংবর্তন কাকে বলে? যে-কোনো দুটি সংবর্তন উদাহরণসহ আলোচনা করো।

১১। সংযোজন কাকে বলে? উদাহরণসহ আলোচনা করো।

১২। বিলোপন জাতীয় সংবর্তন উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও।

১৩। রূপান্তরণ সংবর্তন উদাহরণসহ আলোচনা করো।

১৪। বিপর্যাস ধরনের সংবর্তন নিয়ে আলোচনা করো।

১৫। সংক্ষেপে আলোচনা করো—

(ক) মৌলিক বাক্য (খ) আশ্রয়মূলক বাক্য (গ) সংযোগমূলক বাক্য (ঘ) বাক্য বিগর্ভণ (ঙ) বিলোপন (চ) রূপান্তরণ (ছ) বিপর্যাস (জ) স্থিতিক্রিয়া বিলোপন (ঝ) ক্রিয়াবিশেষণ পরস্থাপন (ঞ) সর্বনামীভবন।

৪০৪.৪.১.৮ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। Noam Chomsky—Aspects of the Theory of Syntax.

২। Noam Chomsky—On Language.

৩। Noam Chomsky—Syntactic Structures.

৪। উদয়কুমার চক্রবর্তী—বাংলা পদগুচ্ছের সংগঠন।

৫। উদয়কুমার চক্রবর্তী—বাংলা সংবর্তনী ব্যাকরণ।

৬। নীলিমা চক্রবর্তী—বাংলা ভাষা ও চমস্কির তত্ত্ব।

৭। উদয়কুমার চক্রবর্তী—বাংলা পদগুচ্ছের সংগঠন।

৮। উদয়কুমার চক্রবর্তী—বাংলা সংবর্তনী ব্যাকরণ।

৯। নীলিমা চক্রবর্তী—বাংলা ভাষা ও চমস্কির তত্ত্ব।

১০। হুমায়ুন আজাদ—বাক্যতত্ত্ব।

NOTES